

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

শ্রীকৃষ্ণ বিহারী গুপ্ত

প্রকাশক—শ্রীরাধেশ রায়
রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ
২১এ রাজা বসন্তরায় রোড, দক্ষিণ কলিকাতা।

প্রিণ্টার—বি, এন, ঘোষ, আইডিয়াল প্রেস
১২।১ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

রায় বাহাদুর

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মিত্র মহোদয়

ভক্তিভাজনেষু—

ভূমিকা

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধগুলি অনেক বৎসর পূর্বে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কবি-বন্ধু শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর ও সৌন্দর্যোপম শ্রীমান্ রাধেশ রায় এই গ্রন্থ প্রকাশে আমাকে নানা ভাবে বিশেষ রূপে সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ভাগলপুর ।
৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪৭ ।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত ।

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
গীতাঞ্জলির ভাবধারা—	১
কবি ও ঋষি—	২৩
দ্বিজেন্দ্রলাল—	৩০
জীবন-চরিতে দ্বিজেন্দ্রলাল—	৪৪
দেবেন্দ্রনাথ সেন—	৫৭
সাহিত্যে মৌলিকতা—	৭৫
দণ্ডাব-কবি গোবিন্দদাস—	৮৬

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

কাব্যমাত্রই প্রধানতঃ রসাত্মক বাক্য ; সুতরাং কোন কাব্যকে রসের দিক হইতে বিচার না করিয়া যদি তাহার মধ্যে আমরা তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে শুধু যে কবির প্রতি অবিচার করা হয় তাহা নয়, কাব্যোপভোগেও আমরা অনধিকারী তাহাই প্রমাণিত হয়। তাই ম্যাথু আর্নল্ড ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের কাব্যসমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তাহার যদি কোন ফিলজফি থাকে, তবে তাহাই তাঁহার কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নহে, তাঁহার কাব্য-সৌন্দর্য্যই সকলের সমধিক উপভোগ্য। একথা সকল কবির সকল শ্রেষ্ঠ কাব্য সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে।

কিন্তু যে কাব্য বা গান ভগবদ্বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত, তাহার মধ্যে তদ্বের প্রাধান্যলাভের সম্ভাবনা আছে—বিশেষতঃ সেই সকল দেশে যেখানে ভগবানকে কতক গুলি নির্দিষ্ট ক্রীড়্ বা অনুশাসনের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হইয়াছে। এই কারণেই ইংরেজি সাহিত্যে ভগবদ্বিষয়ক কবিতা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। কাউপারের Olney Hymns

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

অপাঠ্য, এমন কি মিল্টনেরও বিরাট কল্পনা যখনই থিয়লজির আবার্তে পড়িয়া ঘূর্ণিপাক খাইয়াছে, তখনই তাহা পক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছে। প্যারা-ডাইস্ লষ্টে অনেক স্থলে ইহার উদাহরণ পাওয়া যাইবে। একমাত্র রেকেই ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়।

হিন্দু-সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে, এখানে ভগবানকে তত্ত্ব বা মতের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া ফেলা হয় নাই। ভগবৎতত্ত্ব বা দর্শনের প্রচার যে এখানে হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু মানবের ব্যক্তিগত জীবনে ভগবান ভক্তি ও অনুভূতির সামগ্রীই হইয়া আছেন, তত্ত্ব বা দর্শনের নহে। শুধু তাহাই নহে। হিন্দু পরমেশ্বরকে মানবজীবন ও বিশ্বপ্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখে না। তিনি যেমন জলে স্থলে গ্রহনক্রমে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তেমনই আবার মানবের দৈনন্দিন জীবনে—তাহার সুখে দুঃখে, প্রেমে বিরহে—তিনিই নিজেকে বিচিত্রভাবে প্রকাশ করিতেছেন। তাই হিন্দু কবি যখন মানবজীবন লইয়া কাব্য রচনা করিতে বসেন, তখন ভগবানকে ভুলিয়া থাকে। তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে; আর হিন্দু সাধক যখন ভক্তির প্রবল বেগে চালিত হইয়া উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে ভগবন্মহিমা কীর্তন করিতে থাকেন, তখন তাঁহার সেই গানের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব ও মানব প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়ে। তাই হিন্দুর পারমার্থিক কাব্য ও গান জগতের সাহিত্যে অতুল। কারণ, তাহা একাধারে শ্রেষ্ঠ কাব্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্মসাহিত্য। কবীর, মীরাবাদী, তুকারাম, ভুলসীদাস, চণ্ডীদাস, বিষ্ণুপতি, রামপ্রসাদ—ইঁহাদের উদ্ভব ভারতবর্ষেই সম্ভব হইয়াছে।

সুতরাং তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিতে

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হয়ত এমন-কিছু নূতন নহে। হিন্দুর যে ধর্মসাধনা উপনিষদে ও গীতায় চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে, শাক্ত ও বৈষ্ণবের ভক্তিগদগদ গান ও কোমলকাস্ত পদাবলীতে যাহার শ্রোত কতশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা জাতিকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে, তাহারই একটি ধারা নবরবিকিরণসম্পাতে অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া হিন্দুর চিরন্তন আনন্দবার্তা বহন করিয়াই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। তাই বোধ হয় বাঙ্গালীর নিকট গীতাঞ্জলি ততটা অপূর্ব বলিয়া বোধ হয় নাই যতটা হইয়াছে পাশ্চাত্য দেশে। কারণ, পাশ্চাত্য জাতিসমূহ এই প্রেম ও আনন্দের গানে এমন একটি রসের সন্ধান পাইয়াছে, অনাবিল কাব্য-সৌন্দর্য ও আন্তরিক ভক্তিভাবে এরূপ এক অপূর্ব সমন্বয় দেখিয়াছে, যাহা তাহাদের নিকট যে কেবল সম্পূর্ণ অভিনব বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহা নহে, তাহাদের ভোগোন্মত্ত অশাস্ত প্রাণের সম্মুখে শাস্তি ও আনন্দের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। ইহার তুলনা খুঁজিতে তাহাদিগকে মধ্যযুগের টমাস-এ-কেম্পিস, ফ্রান্সিস্-এসিসি প্রভৃতি ভক্তদের কথা স্মরণ করিতে হইয়াছে ; কেহ কেহ ডেভিডের গান ব্যতীত ইহার সহিত তুলনা করিবার আর কিছু খুঁজিয়া পান নাই। একজন লেখক আমেরিকার একখানি বিখ্যাত পত্রে গীতাঞ্জলির সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিলেন, রবীন্দ্রনাথ কাব্য ও আধ্যাত্মিকতার যেরূপ চমৎকার মিলন সাধন করিয়াছেন, পাশ্চাত্য দেশের কোন কবিই এ পর্য্যন্ত সেরূপ পারেন নাই—মিণ্টন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, এমন কি ডাণ্টে পর্য্যন্ত না। (North American Review for May, 1913)

কিন্তু আমাদের চক্ষে গীতাঞ্জলির নূতনত্ব এত বেশী না হইলেও, ইহা

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

যে কবির সারা জীবনের একনিষ্ঠ কাব্যসাধনারই পরিণতি তাহা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং ইহার মূল উপনিষদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় নিহিত থাকিলেও ইহা এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু, এ-কথাও ভুলিলে চলিবে না। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা গীতাঞ্জলির এই বিশেষত্বটুকুই আলোচনা করিব। এবং সে বৈশিষ্ট্য ইহার অন্তর্নিহিত ভাবধারায় কিরূপ প্রকটিত হইয়াছে তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব।

গীতাঞ্জলির পাঠকমাত্রেরই সর্বাগ্রে যাহা চক্ষে পড়ে, তাহা হইতেছে কবির অসাম্প্রদায়িকতা। যদিও হিন্দুর ধর্মসাধনা কখনও কোন বিশেষ ক্রীড়ে গণ্ডীবদ্ধ হয় নাই, তথাপি বিভিন্ন সাধক এক-একটি নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইয়াছেন। বৈষ্ণবের মধুর ভাব কিংবা শাক্তের জগন্মাতা কালীতারা-রূপ-কল্পনা একই সাধারণ ভাবের অভিব্যক্তি হইলেও স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ভাবেই বিশিষ্টরূপে ভাবুক; কিন্তু তাহা হইলেও ভক্তির এই বিভিন্ন ধারাও তাঁহার নিজস্ব ধারার সহিত মিলিত হইয়া এমনই এক উদার ভাব-শ্রোতের সৃষ্টি করিয়াছে যে, তাহা অঞ্জলিপুটে পান করিয়া সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের ভক্ত তৃপ্ত হইতে পারে। তিনি একাধারে বৈষ্ণব, শাক্ত ও বৈদান্তিক, এবং একজন খৃষ্টানও স্বধর্মমতের অনুকূল অনেক ভাব ইহার মধ্যে দেখিতে পাইবেন। কিশোর 'ভানুসিংহ' প্রৌঢ় সীমায় উপনীত হইয়াও যে বৈষ্ণব-প্ৰীতি হারান নাই তাহার প্রমাণ গীতাঞ্জলির অনেক গানেই রহিয়াছে। শ্রাবণে মেঘের দিনে সকলের অন্তরতম ধন যখন নিশার মত নীরবে সবার দিঠি এড়াইয়া পথিকহীন পথের পরে বাহির হন, কবি তখন তাঁহাকে আপনার কুঞ্জকুটীরে আহ্বান করেন—

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

হে একা সখা, হে প্রিয়তম, রয়েছে গোলা এ ঘর মম.

সমুখ দিবে স্বপন সম

যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে।

‘মেষ্টেমের’ অম্বর রাধার অভিসারের সহায় হইয়াছিল। এখানেও দেখি, যখন ‘মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আবার ক’রে আসে’ তখন কবি তাঁহারই আকুল প্রতীক্ষায় ‘একা দ্বারের পাশে’ বসিয়া আছেন।

তুমি যদি না দেখা দাও, কর আমায় হেলা,

কেমন করে’ কাটে আমার এমন বাদল বেলা!

আবার ‘ঝড়ের রাতে’ তিনি অভিসারে বাহির হইয়াছেন জানিতে পারিয়া কবি তাঁহার দর্শনাকাজ্জ্বল্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন।

নাই যে ঘুম নরনে মম,

ছন্নর খুলি হে প্রিয়তম,

চাই যে বারে বার।

পরান-সখা বন্ধু হে আমার!

কখনও বা গভীর রাতে নিদ্রামগ্ন ভক্তের পাশে নীরবে তিনি আসিয়া বসেন। ভক্ত তাহা জানিতে পারেন না। পরে যখন, ‘জগে দেখে দখিন হাওয়া পাগল করিয়া, গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায় আঁধার ভরিয়া’, তখন বুঝতে পারেন কে আসিয়াছিলেন, আর তাঁহাকে যে পাইয়াও পাইলেন না, এই দুঃখে তিনি রাধার ঞ্চার নিজেকে দিক্কার দিয়া গাহিতে থাকেন—

সে-যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি।

কি ঘুম ভাঙে পেয়েছিল হতভাগিনী।

এসেছিল নীরব রাতে

বীণাধানি ছিল হাতে,

স্বপন মাঝে বাজিয়ে গেল গভীর রাগিনী।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

আবার যখন দিনের অবসানে ধরণীতে সাঁঝের ছায়া নামিয়া আসে, তখন 'জলধারার কলস্বরে সঙ্ক্যাগগন আকুল করে', আর 'বিজন পথে করে না কেউ আসা-যাওয়া', তখন তিনি রাধারই গায় 'কলসখানি ভরে নিতে' ঘাটে যান। তখন তাঁহার 'প্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ উতল হাওয়া'; কারণ, 'ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরনীতে।'

গীতাঞ্জলিতে রাধাকৃষ্ণের রূপক স্পষ্টভাবে রক্ষিত না হইলেও ইহাব মধ্যে বৈষ্ণব-প্রভাবের অন্তঃপ্রবাহ-যে কিরূপ বহিয়া চলিয়াছে তাহা উপরের উদাহরণগুলি হইতেই বিশেষরূপে উপলব্ধ হইবে। আবার শাক্ত সাধকের গায় তিনি ভগবানকে জননীরূপেও আহ্বান করিয়াছেন—

তোমার সোনার খালায় সাজাব আজ দুখের অশ্রুধার,

জননী গো, গাঁথব তোমার গলার মুক্তাহার।

অন্যত্র তিনি আবার জননীর প্রসাদ লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন।—

জননি, তোমার করুণ চরণখানি

হেরিনু আজি এ অরণ্য-কিরণ-রূপে।

কিন্তু এইসব ভাবধারার অপেক্ষাকৃত ক্ষীণধ্বনি ডুবাইয়া দিয়া যে সুর গীতাঞ্জলির অধিকাংশ গানের মধ্যে বাজিতেছে, তাহা হইতেছে উপনিষদের আনন্দের সুর—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—রসো বৈ সঃ— ভগবানকে আনন্দময় রূপে হৃদয় মধ্যে নিবিড়ভাবে অনুভব করিবার জন্য ভক্তপ্রাণের আকৃতি ও আকুলতা। এই একটিমাত্র ভাব গীতাঞ্জলির মধ্যে নানা আকারে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে বলিলেও অত্যাক্তি হয় না।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

‘ভগবানের আনন্দরূপের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গল্প প্রবন্ধে একস্থলে বলিতেছেন,—“তিনি বাক্যের ও মনের অতীত। কিন্তু অতীত হইয়া রহিলেন কৈ ? এই যে দশ দিকে তিনি আনন্দরূপে আপনাকে একেবারে দান করিয়া ফেলিতেছেন। তিনি ত লুকাইলেন না। যেখানে আনন্দে অমৃতে তিনি অজস্র ধরা দিয়াছেন, সেখানে প্রাচুর্যের অন্ত কোথায়, সেখানে বৈচিত্র্যের যে সীমা নাই, সেখানে কি ঐশ্বর্য্য, কি সৌন্দর্য্য ! সেখানে আকাশ যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া আলোকে আলোকে নক্ষত্রে নক্ষত্রে খচিত হইয়া উঠিল, সেখানে রূপ যে কেবলই নূতন নূতন, সেখানে প্রাণের প্রবাহ যে আর ফুরায় না। তিনি যে আনন্দরূপে নিজেকে নিয়ন্তই দান করিতে বসিয়াছেন।”

এই ভাবই গীতাঞ্জলির অনেক গানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। একটিতে তিনি বলিতেছেন—

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে

প্লাবিত করিয়া নিখিল দু্যলোক ভুলোকে

তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।

দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ

মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,

জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।

কিন্তু দিকে দিকে ভগবানের এই আনন্দ-মূর্তির প্রকাশ সম্বন্ধে অবসাদগ্রস্ত মানব-জীবন সকল সময় ত ‘নিবিড় সুধায়’ ভরিয়া উঠে

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

না, আনন্দের এই অনন্ত প্রবাহ এই হৃদয়কে ত প্লাবিত করিতে পারে না। তাহা হইলে আর তাঁহার দর্শন লাভ হইল কৈ? তাই কবি নৈরাশ্রপীড়িত হৃদয়ে গাহিতেছেন।

জগৎ জুড়ে উদাস সুরে আনন্দ-গান বাজে,

সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে?

*

*

*

রয়েছ তুমি এ-কথা কবে জীবন মাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম ধরনিবে সব কাজে?

প্রাণে যখন এই ব্যাকুলতা জাগিয়া ওঠে, তখন আর তাঁহাকে চিনিতে বিলম্ব হয় না। তখনই মানুষ সত্যসত্যই বৃষ্টিতে পাক্স—

এই যে তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ!

এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ।

এই যে মধুর আলসভরে মেঘ ভেসে যায় আকাশ পরে,

এই যে বাতাস দেহে করে অমৃত ক্ষরণ,

এই ত তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ।

ভগবানের আনন্দময়ত্বের সঙ্গে যে ভাবটি অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংপৃক্ত রহিয়াছে, তাহা বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ভগবানের বিচিত্র বিকাশ ও অনন্তরূপ দর্শন। ইংরেজিতে ইহাকে Pantheistic Nature-worship বলা যাইতে পারে। তিনি প্রকৃতির সহিত একাত্মক হইয়া সর্বত্র

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

বিরাজ করিতেছেন । সুতরাং প্রকৃতি-পূজাতেই তাঁহারই পূজা । তাই দেখি
কবি কখনও শারদলক্ষ্মীকে আহ্বান করিতেছেন —

এস গো শারদ লক্ষ্মী তোনার শুভ্র মেঘের রথে,
এস নির্মূল নীল পথে,
এস ধৌত শ্রামল আলোয়লমল ঘন-গিরি-পর্বতে,
এস মুকুটে পরিয়া শ্বেত-শতদল শীতল-শিশির-ঢালা ।

আবার কখনও বা বর্ষার জলভারাবনত মেঘের আবাহন গাইতেছেন—

এস হে এস সজল ঘন বাঙ্গল বর্ষায়ণে,
বিপুল তব শ্রামল রেহে এস হে এ জীবনে ।

‘ এই সসীম প্রকৃতিরাজ্যের রূপসাগরের মধ্যে সেই অসীম সেই
অরূপ রতনের সন্ধান করিতে হইবে ।

রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি ।
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী ।

গেটে যখন বলিয়াছিলেন, ‘Would you penetrate into the
Infinite then press on every side into the Finite’ তখন
তিনি এই তত্ত্বই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন । আমাদের কবি ষাঁহাকে

তুমি নব নব রূপে এস আগে
এস গন্ধে বরণে এস গানে

বলিয়া আবাহন করিতেছেন তিনি অরূপ হইলেও তাঁহার রূপের লীলা

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

যে 'কত বর্ণে কত গন্ধে কত গানে কত ছন্দে' প্রকটিত হইতেছে তাহার কি ইয়ত্তা আছে? সারা বিশ্বজগৎ ব্যাপিয়া রূপ ও অরূপের এই বিরহ-মিলনের লীলা নিরন্তর অভিনীত হইতেছে।

মানবজীবনেও এই সত্যই অনুরূপে প্রকটিত হইতেছে। ক্ষুদ্র মানুষের হাসি-কান্না স্নেহ-প্রেম সেই অসীমেরই আভাস আনিয়া দেয়। এখানেও এই সীমার মধ্যে সেই অসীমেরই লীলা চলিতেছে।

সীমার মধ্যে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর;
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর ॥

গীতাঞ্জলিতে এই যে ভাবটা প্রকাশ পাইয়াছে, কবি বলেন ইহাই তাঁহার সমগ্র কাব্যসাধনার মূলে রহিয়াছে। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি লিখিতেছেন,—“আমার ত মনে হয় আমার সমস্ত কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পাতা। সে পাতার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পাতা।” অতি অল্প বয়স হইতেই এই ভাবটি কবির হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। তাঁহার প্রথম যৌবনে রচিত 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক নাট্য-কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবও ইহাই। “এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহ-বন্ধন মায়া-বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপর জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুই বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল—ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ,

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি । প্রেমের আলো যখন
পাই তখনি যেখানে চোখ মেলি সেইখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা
নাই । * * * প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে একদিকে যত সব পথের
লোক, যত সব গ্রামের নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘরগড়া প্রাত্যহিক
তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে ; আর একদিকে
সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘরছাড়া এক অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে
ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে । প্রেমের সেতুতে
যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল,
তখন সীমায় অসীম মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের
মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল ।”

এই যে প্রেমের পথ দিয়া অসীমকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা, ইহা
হইতেই কবির বিশ্বপ্রেমের উদ্ভব । বাহ্য প্রকৃতির রূপসাগরে ডুব দিয়া
দিয়া তিনি যেমন অরূপের সন্ধান পান, তেমনই মানবের কৰ্ম্মপ্রবাহে
ঝাঁপ দিয়া, তাহাকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া তিনি সেই অসীমেরই
সমীপে উপস্থিত হইবেন এই আশা করেন । তিনি জানেন—

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো,

সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো ।

নয়ক বনে, নয় বিজনে,

নয়ক আমার আপন মনে,

সবার সেথায় তুমি, হে প্রিয়,

সেথায় আপন আমারো ।

কিন্তু এই প্রেম কি সহজে লাভ করা যায় ? ইহাও সাধনা-লভ্য হবে
যে ইহা সম্ভব হইবে তাহা কবি জানেন না ।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে বিণাল ভবে
প্রাণের রথে বাহির হ'তে পার্ব কবে ?

প্রবল প্রেমে সবার মাঝে ফির্ব ধয়ে সকল কাজে,
হাটের পথে তোমার সাথে মিলন হবে,
প্রাণের রথে বাহির হ'তে পার্ব কবে ?

কিন্তু তাঁহার আশা আছে—

যখন আমি পাব তোমায় নিখিল মাঝে
সেইখনে হৃদয়ে পাব হৃদয়রাজে।

নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডী ছাড়াইয়া বিশ্বের মধ্যে আপনাকে ব্যাপ্ত
করিয়া দিতে না পারিলে, যাহারা 'সবার অধম, দীনের হতে দীন',
যাহারা 'সবার নীচে, সবার পিছে' তাহাদের ভালবাসিতে না পারিলে
ভগবৎপ্রেম নিরর্থক।

কবির স্বদেশপ্রেমও এই বিশ্বপ্রেমের উদারভাবে অনুপ্রাণিত। ভারত
শুধু তাঁহার নিজের দেশ নহে, ইহা 'মহামানবের সাগরতীর'। আর এই
ভারতের মধ্যে যাহারা পতিত জাতি বলিয়া অপমানিত ও নিপীড়িত
তাহাদের জন্ত করুণায় তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়াছে।

হে মোর ছুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হ'বে তাহাদের সবার সমান।

আমরা দেখিলাম, ভগবান আনন্দরূপে বিশ্বপ্রকৃতিতে এবং প্রেমরূপে
বিশ্বমানবের মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। এতক্ষণ আমরা তাঁহার শিবসুন্দর

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

মূর্ত্তিই দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার যে অন্ত মূর্ত্তিও আছে, তিনি যে দুঃখ ও অশুভরূপেও আপনাকে প্রকাশ করেন, তাহাও কবি আমাদের কাছে ভুলিতে দেন নাই। কিন্তু ইহা সেই আনন্দময়েরই রুদ্ররূপ। দুঃখ ত সত্য নহে, একমাত্র সত্য হইতেছে আনন্দরূপম্। তবে আমরা চক্ষুর সম্মুখে নিরন্তর এত দুঃখ এত কষ্ট দেখি কেন? নিজেরাও ত দুঃখকষ্টে জর্জরিত হইতেছি? কিরূপে ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করি?

রবীন্দ্রনাথ বলেন, “আমাদের ছোট মনের ছোট ছোট বিষাদ অবসাদ নৈরাশ্য নিরানন্দ আমাদের কাছে অন্ধ করিয়া দেয়, আনন্দরূপম্ অমৃতম্ আর দেখিতে পাই না; নিজের কালিমা দ্বারা আমরা একেবারে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকি, চারিদিকে কেবল ভাঙাচোরা, কেবল অসম্পূর্ণতা, কেবল অভাব দেখি;—কাণা যেমন মধ্যাহ্নের আলোকে কালো দেখে, আমাদেরও সেই দশা ঘটে। একবার চোখ যদি খোলে, যদি দৃষ্টি পাই, হৃদয়ের মধ্যে নিমেষের মধ্যেও যদি সেই আনন্দ সপ্তকে সপ্তকে বাজিয়া উঠে,—যে আনন্দে জগদ্যাপী আনন্দের সমস্ত সুর মিলিয়া যায়, তবে যেখানেই চোখ পড়ে, সেখানে তাঁহাকেই দেখি আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। বধে বন্ধনে, দুঃখে দারিদ্র্যে, অপকারে অপমানেও তাঁহাকেই দেখি— আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তখন মুহূর্ত্তেই বৃষ্টিতে পারি প্রকাশমাত্রই তাঁহারই প্রকাশ—এবং প্রকাশমাত্রই আনন্দরূপমমৃতম্। তখন বৃষ্টিতে পারি, যে আনন্দে আকাশে আকাশে আলোক উদ্ভাসিত, আমাতেও সেই পরিপূর্ণ আনন্দেরই প্রকাশ। সেই আনন্দে আমার ভয় নাই, ক্ষতি নাই, অসম্মান নাই।” (ধর্ম্ম, ১৯১-২ পৃষ্ঠা)।

‘নৈবেদ্যে’র একটি গানে ঠিক এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে।—

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি যাই,—

কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।

মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ

দুঃখ সে হয় দুঃখের কুপ

তোমা হ'তে যবে স্বতন্ত্র হয়ে আপনার পানে চাই।

‘খেরা’র কবি দুঃখকে ভগবানের মূর্তিরূপে বরণ করিতেছেন,—

দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে,

যেথার ব্যথা সেথার তোমা নিবিড় ক'রে ধরিব হে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ‘দুঃখ’-শীর্ষক প্রবন্ধেও দুঃখের সহিত ভগবানের এই একাত্মকতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

হে পিতা তুমিই দুঃখ, তুমিই বিপদ, হে মাতা, তুমিই মৃত্যু তুমিই ভয়। তুমিই
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্। (ধর্ম ১২৯ পৃষ্ঠা)

‘গীতাঞ্জলিতে’ও এই একই সুর ধ্বনিত হইয়াছে। রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য
ভীষণ হইলেও মঙ্গলকর, তাঁহার তীব্র তালের আঘাতে মানুষের বক্ষঃপঞ্জর
চূর্ণ হইয়া গেলেও যে, তাহাতে সমস্ত সন্দেহ মন হইতে পলায়ন করে,
সে কথা স্মরণ করিয়া তিনি ‘সেই প্রচণ্ড মনোহরে’ প্রেমের অঞ্জলি দিয়া
হৃদয়ে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

নাচো যখন ভীষণ সাজে তীব্র তালের আঘাত বাজে,

পালার আসে পালার লাজে সন্দেহ বিহ্বল।

সেই প্রচণ্ড মনোহরে প্রেম যেন মোর বরণ করে,

সুদ্র আশার স্বর্গ তাহার দিক সে রসাতল।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

তারপরে যখন সত্যসত্যই রুদ্রের দীপ্তবজ্র ভক্তের বক্ষে পড়িয়া সেখানে
জাবাগ্নি জ্বলাইয়া দেয়, তখনও সে অটল বিশ্বাসে তাঁহাকে বন্দনা
করিতে থাকে—

এই করেছ ভালো নিষ্ঠুর, এই করেছ ভালো
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন আলো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি চালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো।

যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার—
আঘাত সে যে পরশ তব, সেই ত পুরস্কার।
অন্ধকারে মোহে লাঞ্জে চোখে তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোল আঙুন করে' আমার যত কালো।

আর মৃত্যু ? সে ত 'আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা'—বরবধুর
মিলন। তাহার জন্ম আমার ভয় কি ? দুঃখ কি ? শ্মশানচারী মহাদেব
যখন গৌরাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার জননী শিরে
করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিলেও এবং পিতা দুঃখে মিয়মাণ হইলেও গৌরী
নিজে কি ভীতা হইয়াছিলেন ?

শুনি শ্মশানবাসীর কলকল,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !
সুখে গৌরীর অঁাখি ছলছল
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ !

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

তার মাতা কাঁদে শিরে হানি কর
খ্যাপা বরেরে করিতে বরণ,
তার পিতা মনে মনে পরনাদ,
ওগো মরণ, হে মোর নরণ।

আমরাও কি ক্রন্দন-কোলাহলের মধ্যে এইরূপে হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারিব না? সারা জনম যাহার লাগিয়া সুখ-দুঃখের বোঝা বহিয়া বেড়াই, সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা কি-এক অজ্ঞাত আকর্ষণে যাহার দিকে নিরন্তর ধাবিত হয়, তাহার সহিত মিলনই ত জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা।—

বরণ-মালা গাঁথা আছে আমার চিত্তমাঝে,
কবে নীরব হস্তমুখে আসবে বরের সাজে?
সেদিন আমার হবে না ঘর, কেইবা আপন কেইবা অপর
বিজন রাতে পতির সাথে মিলবে পতিব্রতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। যাহা কিছু আবির্ভাব তাহা সেই আনন্দরূপেরই আবির্ভাব। দুঃখে মৃত্যুতে সেই আনন্দময়েরই প্রকাশ। এই বাণী শুধু গীতাঞ্জলিতে নয়, অগ্ৰত্ৰও নানারূপে তিনি প্রচার করিয়াছেন। রুদ্রের ভীষণ মুখ দেখিয়া তিনি সেই প্রাচীন ঋষির অভয়-মন্ত্র শুনাইতেছেন—রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্,—হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা কর। কিন্তু তাঁহার যে, 'সেই রক্ষা, তাহা ভয় হইতে রক্ষা নহে, মৃত্যু হইতে রক্ষা

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

নহে, বিপদ হইতে রক্ষা নহে, তাহা জড়তা হইতে রক্ষা, ব্যর্থতা হইতে রক্ষা, তাঁহার অপ্রকাশ হইতে রক্ষা’—

বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয় ।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে নাহি বা দিলে সাহসনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয় ।
আমারে তুমি করিবে জাগ এ নহে মোর প্রার্থনা,
ভরিতে পারি শক্তি যেন রয় ।
আমার ভার লাঘব করি নাহি বা দিলে সাহসনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয় ।

অতএব

‘হে ভয়ঙ্কর, হে শঙ্কর হে পিতা হে বন্ধু, অন্তঃকরণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির দ্বারা উদ্ভূত চেষ্টার দ্বারা, অপরাঞ্জিত চিন্তের দ্বারা তোমাকে ভয়ে দুঃখে মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিব, কিছুতেই কৃষ্টিত অভিভূত হইব না, এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতে থাকুক—এই আশীর্বাদ কর ।

এমনই করিয়া আনন্দের বার্তা জগতে বড় বেশি লোক প্রচার করেন নাই । এমনই করিয়া দুঃখ, ভয়, মৃত্যু, অবসাদ তুচ্ছ করিয়া আত্মশক্তির উদ্বোধন করিতে শিক্ষা দিতে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত বর্তমান যুগে অধঃপতিত ভারতবর্ষে আর কেহ আবিভূত হ’ন নাই ।

বিবেকানন্দের সহিত আধ্যাত্মিক জগতে রবীন্দ্রনাথের যে শুধু এইখানেই মিল তাহা নহে । মানবের হিতসাধন দ্বারা ভগবান্নাথের যে পথ, বিবেকানন্দ তাহাই প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বারংবার নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন ।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

আমরা দেখিয়াছি রবীন্দ্রনাথও এই প্রেমের পথ দিয়াই, এই কর্মযোগে বিশ্ব-মানবের সহিত এক হইয়াই আনন্দময়ের দর্শনলাভ সম্ভব বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। ইহার তুলনায় জপতপ ধ্যানধারণা দ্বারা মুক্তিলাভ-চেষ্টাও বাহ্যনীয় নহে।

মুক্তি ? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি ? মুক্তি কোথায় আছে ?

আপনি এতু সৃষ্টিবাধন পরে' বাঁধা সবার কাছে।

রাখ্ রে ধ্যান, থাক্ রে কুলের ডালি,

ছিড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি,

কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে কর্চে চাষা চাষ,

পাথর ভেঙে কাট্চে যেথায় পথ, খাট্চে বারোমাস।

রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,

ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে ;

তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয়রে ধূলায় 'পরে।

এই জন্মই ত অন্তর তিনি বলিয়াছেন—

‘বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।’

এবং ইহাই যে তিনি ‘প্রকৃতির প্রতিশোধে’ সন্ন্যাসীর জীবনে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ‘অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ’। একদিকে তিনি যেমন রূপরসগন্ধময়ী প্রকৃতির সৌন্দর্য্য হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যোগাসনে বসিতে চাহেন না, কারণ, এই সৌন্দর্য্যের, এই আনন্দের মধ্যেই ভগবান

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

আছেন। অপর দিকে তেমনই আবার তিনি মানবের কর্মকোলাহল হইতেও নিজেকে সরাইয়া লইতে ইচ্ছা করেন না, কারণ, সেখানেও সেই তিনিই রহিয়াছেন।

কিন্তু তাই বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন, যে কবি বিষয়ভোগাসক্তি বা সাংসারিক মোহান্বিতাকে আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি তাঁহার গদ্য প্রবন্ধে বলিতেছেন—

এই রেশম-পশম, আসনবসন, স্বর্ণরৌপ্য আমার কে? তাহারা আমাকে কি দিতে পারে? তাহারা আমার পরম সম্পদকে অন্তরাল করিতেছে, কেবল তাহাদের পুঞ্জীভূত সঞ্চয়ে গর্ভবোধ করিতেছে। * * * সর্বাপেক্ষা হীনতম দীনতা যে পরমার্থ-হীনতা তাহার দ্বারা সমস্ত অন্তঃকরণ রিক্ত, শ্রীহীন, মলিন। কাজ করিতে পারি না, কারণ শয্যা আসন বেণভূষার কাছে দাসখণ্ড লিখিয়া দিয়াছি, জড় উপকরণ জঞ্জালের কাছে মাথা বিকাইয়া দিয়াছি—সেই সকল ধূলিময় পদার্থের ধূলা ঝাড়িতেই আমার দিন যায়। * * * সকল মঙ্গলকর্ম পাড়িয়া রহিল, কারণ পাঁচ জনের মুখে নিজের নামকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়া আড়ম্বরে জীবন যাপন করিতেই আমার সমস্ত চেষ্টির অবসান। যিনি সকল সত্যের সত্য, অন্তরে বাহিরে, জানে ধর্ম কোথাও তাঁহাকে দেখি না। (ধর্ম, ৫২ পৃষ্ঠা)

এই ‘জাল জঞ্জালগুলিতে’ যদি মানুষের হৃদয় মন জড়াইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার উপরে উঠিবার সমস্ত শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। তখন হয়ত তাহার লক্ষ্য ভ্রষ্ট জীবনের ব্যর্থতা মাঝে মাঝে তাহাকে পীড়া দিতে থাকে। গীতাঞ্জলির একটি গানে কবি বলিতেছেন—

ধনে জনে আছি জড়ানে হার।

তবু জানো মন তোমারে চার।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

এই আক্ষেপ অগ্ন্যান্ত গানেও ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—

বিষয়-বোঝা টানে আমার নীচে।

আবার—

কত মায়ী বাঁশীর সুরে ডাকচে আমার মিছে।

কিন্তু মানুষের এমনই দুর্বলতা, যে, সে এসব মোহবন্ধন কিছুতেই ছিন্ন
করিতে পারে না।

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই-

ছাড়ায়ে গেলে ব্যথা বাজে।

মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই

চাহিতে গেলে মরি লাজে।

জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম,

এমন ধন আর নাহি যে তোমা সম,

তবু যে ভাঙা চোরা ঘরেতে আছে পোরা

ফেলিয়া দিতে পারি না যে।

তখন তাঁহারই শরণ লওয়া ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই।

তোমার দয়া যদি চাহিতে না-ও জানি,

তবুও দয়া করে' চরণে নিয়ে টানি।

আমি যা গড়ে' তুলে আরামে থাকি ভুলে

স্বথের উপাসনা করি গো ফলে ফলে,

সে ধূলা-খেলাঘরে রেখো না ঘৃণাভরে

জাগায়ো দয়া ক'রে বহি-শেল হানি।

শেষে যখন সত্যসত্যই তিনি বহি-শেল হানিয়া মানবের তুচ্ছ পাখিব

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

সুখসম্পদ ভস্মীভূত করিয়া দেন, তখন যে প্রকৃত ভক্ত, সে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে
গায়িতে থাকে—

আমি বহু বাসনায়ে প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে ?

এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভরে' ।

এই বিষয়সুখ-লালসার সহিত অহঙ্কার জড়িত হইয়া আছে ।
ইহাকেও দূর করিতে হইবে । অহঙ্কারের মলিন বস্ত্র ছাড়িয়া প্রেমের
বসন পরিয়া তাঁহার পূজা করিতে না পারিলে তাঁহাকে কি পাওয়া যায় ?

ছাড়িতে পারিনি অহঙ্কারে,

ঘুরে মরি শিরে বহিয়া তারে ;

ছাড়িতে পারিলে বাঁচি যে হার ।

তুমি জান মন তোমাতে চায় ।

তখনও তাঁহারই চরণে প্রার্থনা করিতে হয়—

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধুলার তলে,

সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোপের জলে ।

কিন্তু যখন হৃদয়ে ভগবদ্দর্শনজনিত ভূমানন্দের সঞ্চার হয়, যখন সেই
'আনন্দেরই সাগর থেকে' বান আসিয়া মানুষকে অনন্তের দিকে ভাসাইয়া
লইয়া যায়, তখন এক নিমেষে বিষয়াসক্তি ছুটিয়া যায়,—তখন আর
কাহারও কথা না শুনিয়া মন সেই আনন্দময়ের চরণে আত্মসমর্পণ করে—

কে ডাকে রে পিছন হতে, কে করে রে মানা ?

ভয়ের কথা কে বলে আজ, ভয় আছে সব জানা ।

এখন হইতে সাধনপথের সমস্ত বাধা দূর হইল । সম্মুখে আনন্দ-

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

সাগর ; আর তাহাতে ও কোন্ কাণ্ডারী তরণী বাহিয়া চলিয়াছেন ?
তাঁর অমল ধবল পাঁলে মন্দ মধুর হাওয়া লাগিয়াছে । আহা ! এ তরী

কোন সাগরের পার হ'তে আনে কোন্ সুদূরের ধন ।

ভেসে যেতে চায় মন,

ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় সব চাওয়া, সব পাওয়া ॥

এইখানে আমার গীতাঞ্জলিব্যাখ্যা শেষ করি । আমি তত্ত্বের সন্ধানে
এই গীতিকুঞ্জ প্রবেশ করি নাই, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি
গান বা কবিতা হৃদয়ের বস্তু, হৃদয় দ্বারাই তাহা গ্রহণ করিতে হইবে
আমি আমার প্রাণের অনুভূতি দিয়া এই গানগুলির মধ্যে যতটুকু প্রবেশ
করিতে পারিয়াছি, তাহাই এখানে প্রকাশ করিলাম, যুক্তিতর্কের সাহায্যে,
কোন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাই নাই ।

আমি যে ভাবধারার বিবৃতি করিলাম তাহা কাব্যরসের দিক হইতে,
ব্যক্তিগত অনুভূতির দিক হইতে । : সুতরাং যদি অন্য কেহ
গানগুলির মধ্যে অন্তরূপ ভাবের লীলা লক্ষ্য করিয়া থাকেন তাহা
হইলেও পরস্পরকে ভ্রান্ত মনে করিবার কারণ নাই । কারণ
শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য মাত্রেরই এই গুণ আছে যে, তাহা বিভিন্ন পাঠকের
নিকট বিভিন্ন ভাবের উৎসরূপে প্রতিভাত হয় । তা' ছাড়া,
আমি গীতাঞ্জলির অংশমাত্র লইয়া আলোচনা করিলাম । সমগ্র কাব্যখানির
উপর আরও অনেক কথা বলিবার আছে ।

কবি ও ঋষি

স্মরণাতীত কাল হইতে পৃথিবীর সভ্য দেশসমূহে এমন অনেক দিব্যশক্তি-সম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহাদের স্বচ্ছ মানস-দর্পণে বিশ্বের গুণতত্ত্ব-সকল প্রতিফলিত হইয়া ধরা দিয়াছে, এবং যাহারা সেই-সকল আত্মোপলব্ধ সত্য জনসমাজে প্রচার করিয়া মানব-সভ্যতার বিকাশ-ধারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন।

ইহাদের সকলকেই মন্ত্রদ্রষ্টা বা সত্যদ্রষ্টা ঋষি আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। শুধু বেদমন্ত্র কেন, অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎকার বা উপলক্ষিমাত্রেই অপৌরুষেয়। কারণ তাহা মানবের মধ্য দিয়া পরমব্রহ্মের পূর্ণ জ্যোতির আংশিক প্রকাশ এবং এই-সকল ভগবদনুগৃহীত মহাপুরুষই ঋষি, তা সে তাঁহারা যে-দেশের ও যে-যুগেরই হউন না কেন।

যদিও প্রাচীনকালে প্রধানতঃ বেদমন্ত্রের রচয়িতাদেরই আমাদের দেশে ঋষি বলা হইত, তথাপি কপিল-কণাদাদি ষড়্দর্শনকার

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

এবং ব্যাস, বাম্বীকি প্রভৃতি মহা-কবিগণও ঋষি নাম পাঠিয়েছেন। ইঁহারা কেহই মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন না। সূতরাং অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেরও শ্রেষ্ঠ মনীষী বা কবির বিশিষ্ট গুণ বুঝাইবার জন্য ঋষি শব্দের ব্যবহার অসঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি না। গত্যর্থ (=বুদ্ধ্যর্থ)-বাচক ঋষি শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ ধরিলেও এরূপ প্রয়োগে কোন দোষ আসে না।

অলৌকিক জ্ঞান বুদ্ধি বা মনীষার আলোকে যঁহার চিত্তাকাশ উজ্জ্বল এবং এক স্বর্গীয় প্রেরণায় যিনি নিজ হৃদয়ে পরম সত্যের অনুভূতি লাভ করেন তিনিই ঋষি।

সূতরাং ঋষি যে শুধু প্রাচীন যুগেই আবির্ভূত হইতেন এবং এখন আর দৃষ্টিগোচর হ'ন না, এরূপ কথা বলা চলে না। যখনই কোন কবি, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক চিরন্তন ধ্রুব সত্যের একটা অভিনব দ্বার খুলিয়া দেন, তখনই আমরা ঋষির সাক্ষাৎকার লাভ করি।

আমি কবির কথাই বিশেষ করিয়া বলিব। সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসক কবি আপনার কাব্য-সৃষ্টির অন্তরালে যে-সকল গভীর তত্ত্বের আভাস দেন, তাহা ঋষির সত্য-দর্শন হইতে ন্যূন নহে। বৈদিক ঋষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত যঁহারা ঞায়, ধর্ম, সত্যমূলক ভগবানের পরমবাণী প্রচার করিয়াছেন তাঁহারা একাধারে কবি ও ঋষি।

ঈসা, মুসা ঞায় যঁহারা ঐশী শক্তির প্রভাবে দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া সত্যধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা Prophets বা ঋষি নামে বিদিত হইলেও তদানীন্তন যুগের কবি ছিলেন।

গীতাঞ্জলির ভাষা

তাই কবি শেলী বলিয়াছেন—Poets were called, in the earlier epochs of the world, legislators or prophets ।

শেলীর এই উক্তির মর্ম্ম এইযে, এই-সকল মহাপুরুষগণ প্রকৃতপক্ষে কবিই ছিলেন, লোক তাঁহাদিগকে কবি না বলিয়া শাস্তা, শাস্ত্রকার, ভাববাদী বা ঋষি আখ্যা দিয়াছে ।

লড বেকনও তাঁহার একটি প্রবন্ধে (‘Of Religion’) প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, কাব্যই ছিল তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র এবং কবিগণই ছিলেন তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকার ।

বৈদিক ঋষিগণের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া ম্যাকডোনেল সাহেব স্বরচিত ‘সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে’ কয়েকটি ঋকের অনুবাদ করিয়া তাহাদের কাব্যসৌন্দর্য্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । এই-সকল আত্মজ্ঞানী ঋষি যে ভগবৎপ্রভাবান্বিত কবি ছিলেন, তাহা আমাদের স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই ।

ঋষির গায় কবিরও সেই ‘vision and the faculty divine’—সেই পরমজ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি থাকে, যাহাতে উভয়কে একই শ্রেণীতে ফেলিতে পারা যায় । একথা যদি সত্য হয় যে, ‘Poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds’ —কবিতা আন্দোষ্টাসিত-চিত্ত মনীষীর অসীমানন্দপূর্ণ শুভ মুহূর্ত্তগুলির পরিচয় দেয়, তাহা হইলে আর কবিত্বে ও ঋষিত্বে প্রভেদ কি ? একদিকে যেমন “ঋষির নয়ন মিথ্যা হেরে না, ঋষির রসনা মিছে না

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

কহে,” তেমনই অপরদিকে আবার কবির শ্রেষ্ঠ-মুহূর্ত-সঞ্জাত আনন্দ-ধারা-প্লুত আয়োপলক্কিও কখনও মিথ্যা হইতে পারে না।

কবি যে আপনার প্রাণের অন্তরতম প্রদেগে নিরন্তর এক অজ্ঞাত শক্তির প্রেরণা, এক অনির্কচনীয় উন্মাদনা, এক স্বর্গীয় আবেশ অনুভব করেন, তাহার উল্লেখও এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহা সেই রহস্যময়ী শক্তি যাহার মধ্যে কবি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া বিহ্বল প্রাণে বলিতে থাকেন—

একি কোতুক নিত্য নুতন
ওগো কোতুকময়ী,
আমি য'হা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই?
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুগ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীতস্রোতে কুল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে।

কবির এই অন্তরবাসিনী প্রেরণাই তাঁহার জীবন-দেবতা। কবি নিজেকে এই দেবতার হস্তের বীণাটি মাত্র, তিনিই কবিকে দিয়া আপনার গান গাওয়াইতেছেন, আপনার বাণী প্রচার করিতেছেন। একথা যে শুধু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, এবং ইহা যে শুধু তাঁহারই নিজস্ব আত্মানুভূতি, তাহা নয়। শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই এই অসীম রহস্যময়ী শক্তির সম্পূর্ণ অধীন।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

শেলী তাই কবির হৃদয়ে প্রকৃত কবিত্বের বিকাশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—
It is, as it were, the interpretation of a diviner nature through our own—ইহা যেন আমাদের মধ্য দিয়া কোন স্বর্গীয় প্রকৃতির আত্ম প্রকাশ।

মহাকবি গেটেও এই ঐশী শক্তির বশত স্বীকার করিয়াছেন। তিনিও ইহাকে Genius of Life বা জীবন-দেবতা বলিয়াছেন, 'which does with him what it pleases and to which he unconsciously resigns himself. whilst he believes he is acting from his own impulse'—

এই জীবন-দেবতা কবিকে যদৃচ্ছাক্রমে চালিত করেন, এবং কবি যখন মনে করেন, তিনি নিজের ভাবাবেশে লিখিতেছেন, তখন তিনি প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞাতসারে এই শক্তির নিকট আত্মোৎসর্গ করেন।”

গেটের এই উক্তি কি রবীন্দ্রনাথেরই “তুমি যা বলাও আমি বলি তাই” কথাই রূপান্তর মাত্র নহে? এই দিব্য শক্তি যাহার জীবন-দেবতা Genius of Life, এবং যিনি এই শক্তির প্রভাবে diviner nature বা স্বর্গীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হন, তিনি ঋষি হইতে কম কিসে?

তবে যে সকলে কবিকথাকে ঋষিবাক্যের গায় শিরোধার্য করিয়া লয় না, তাহার কারণ, লোকের রুচি, সংস্কার ও প্রকৃতির বিভিন্নতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঋষিমাত্রেরই মত বা উক্তি কি আমরা সকলেই গ্রহণ করি? চার্বাক ঋষির নাস্তিকতা কিংবা কপিল ঋষির সাংখ্য মত যেমন সর্বজনগ্রাহ্য হয় নাই, সেইরূপ সকল কবির প্রচারিত মত বা তত্ত্ব সকলে মানিয়া লইতে না পারেন।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

আধুনিক ঋষিদের মধ্যে টলষ্টয়ের স্থান অতি উচ্চে। কিন্তু ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রসংক্রান্ত তাঁহার মত অনেকেরই—বিশেষতঃ গোঁড়া খৃষ্টানদের—মনঃপূত হয় নাই।

কবি ওয়াড'স-ওয়ার্থের কাব্য-সাধনার মূল মন্ত্র ছিল,—সমগ্র বিশ্বে এক ঐশ্বরিক সত্তার ব্যাপ্তি বা প্রকাশের উপলক্ষি, অথবা আমাদের ভাষায় “সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।” ইহা ইংরেজ পাঠক কবির একটা মত বা ধারণামাত্র বলিয়া মনে করেন। কারণ, তাঁহাদের ধর্ম্যে ঠিক ইহার অনুরূপ কিছু নাই। আমরা কিন্তু মনে করি যে, ইংরেজ কবির হৃদয়ে এই মহাসত্যটির উন্মেষই তাঁহাকে ঋষিত্বে উন্নীত করিয়াছে। কারণ, তিনি কবিত্ব-প্রভাবে হিন্দু ঋষির তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি যখন এই সর্বব্যাপী সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—A motion and a spirit that impels all thinking things, তখন আমাদের উপনিষদের “যেনাহ্মনোমতম্” মনে পড়িয়া যায় এবং ইংরেজ কবি হিন্দুর এই তত্ত্বের কত নি কটে পৌঁছিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারি। এইখানেই তাঁহার ঋষিত্ব। সুতরাং কোন বড় কবির মত বা তত্ত্ব আমরা গ্রহণ করিতে পারি না বলিয়া যে তিনি ঋষি হইতে পারেন না, এরূপ যুক্তি দাঁড়াইতে পারে না।

আর ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, ঋষি বলিতে ঠিক saint বা সাধু বুঝায় না। সুতরাং কোন কোন কবি সামাজিক হিসাবে আদর্শ জীবন যাপন করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাদের ঋষিত্বের হানি হয় নাই। আমাদের প্রাচীন ঋষিদের মধ্যেও শকুন্তলার জনক বিশ্বামিত্র এবং কৃষ্ণ শ্বেপায়নের জনমিতা পরাশর অকলুষিত-চরিত্র ছিলেন না। শুধু

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

চন্দ্রে নয়, সূর্য্যোও কমলক আছে। কিন্তু চন্দ্রের পক্ষে যাহা কালিমা হইয়াছে, সূর্য্যের স্বীয় দীপ্ত তেজ তাহা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

এ কথা বলা নিশ্চয়োজন যে কবিমাত্রেই ঋষিদের দাবী করিতে পারেন না। নূতন বাণী শুনাইতে বা নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতে বড় বেশী কবি জন্মগ্রহণ করেন না। কল্পনার হাওয়ায় ভাষার রঙ্গীন ফানুস উড়াইতে পারিলেই বড় কবি হওয়া যায় না। এই শ্রেণীর কবিদের প্রতিভা যদি প্রদীপ্ত অনলের গ্যায় উজ্জ্বল না হয়, এবং তাহার সহিত যদি গভীর অন্তর্দৃষ্টি, প্রগাঢ় আত্মানুভূতি, এবং সর্বোপরি এক দিব্য শক্তির ভাবাবেশ সম্মিলিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিব না। এবং তাঁহাদের কবিদে ঋষিদের ধর্ম বা গুণ থাকিতে পারে না।

ইংরেজীতে এইরূপ শ্রেষ্ঠ কবিকে *transcendental poet* বা অতীন্দ্রিয়দর্শী কবি বলে। আমাদের আধুনিক সাহিত্যের কাব্যকুঞ্জ অনেক কবির মধুর ঝঙ্কারে মুখরিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কাহাকেও ঋষিকবি বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ শুধু শ্রেষ্ঠ কবি নহেন, তিনি অদ্বিতীয় মনীষী। তিনি নোবেল প্রাইজ্ পাইয়াছেন বলিয়াই যে বড় কবি হইয়াছেন তাহা নহে। দেশ তাহার অনেক পূর্বেই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশে তাঁহার কিরূপ আদর হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে ওয়াডস্‌ওয়ার্থ, মিল্টন, ডাণ্টে অপেক্ষা বড় কবি বলিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল

(১)

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যনাটকাদির দোষগুণ বিচার করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির অঙ্গুরালে যে উদ্দেশ্যের প্রেরণা আমরা পরিস্ফুটরূপে দেখিতে পাই, তাহাই আজ আমাদের আলোচ্য। তিনি প্রধানতঃ লোকশিক্ষার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, দেশহিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারই শিক্ষা দেশবাসীকে দিয়া গিয়াছেন। তিনি মর্মে মর্মে বুঝিয়াছিলেন—

বিশ্ব মাঝে নিঃস্ব নোরা অধম ধূলি চেয়ে ;

তাই তিনি শুধু কোমল ভাবের বন্যায় দেশকে প্লাবিত না করিয়া বিজ্রপের কশা ও পৌরুষের আগুন লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। একদিকে যেমন ভণ্ড ও অসাধুর পৃষ্ঠদেশে তাঁহার এই ব্যঙ্গ-বিজ্রপের কশা বর্ষিত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনই আবার তাঁহার পৌরুষপূর্ণ স্বদেশ-প্রেমের বহ্নিতে জনসাধারণের মনকে বিশুদ্ধ ও ভক্তিপূত করিতে তিনি চেষ্টিত হইয়াছেন। অধঃপতিত জাতির চরিত্রগত দোষসমূহের সংশোধন,

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

দেশেরই ইতিহাস হইতে বীরত্ব, মনুষ্যত্ব ও দেশভক্তির অপূর্ব আদর্শ প্রদর্শন, এবং পরিশেষে আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীকে তাহার গৌরবমণ্ডিত অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া তাহার স্মিয়মাণ প্রাণে আশা ও উৎসাহের উদ্বোধন,—এই উদ্দেশ্যের প্রেরণাই দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যসৃষ্টির ধারা নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল।

দেশের যাহা কিছু সমস্তই তিনি ভালবাসিতে পারেন নাই। আমাদের আচারে, ব্যবহারে, সমাজে, ধর্মে, যে সকল দোষ, ত্রুটি, কদাচার, কুপ্রথা দেশের অশেষবিধ অনিষ্ট সাধন করিতেছে, সেগুলিকে তিনি সনাতন বলিয়া মানিয়া না লইয়া নিস্ময়ভাবে উৎপাটিত করিয়া ফেলাই কর্তব্য মনে করিয়াছিলেন। ব্যাধিভূষ্ট মৃতবৎ সমাজশরীরে তীব্র তিক্ত মুষ্টিবোগ প্রয়োগে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। এই কারণে ষাঁহার ঠাঁহার স্বদেশপ্রেমে আন্তরিকতার অভাব দেখেন ঠাঁহার। এই দেশভক্তের প্রতি ঘোর অবিচার করেন। সুদীর্ঘ কালের পরাধীনতায় রুদ্ধগতি জাতীয় জীবনে কি পক্ষিল আবিলতা আসে নাই? এবং তাহার ফলে কি আমাদের নৈতিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অশেষ অবনতি হয় নাই? যদি তাহা হইয়া থাকে ধর্ম ও সমাজ নানা কুসংস্কার ও কুপ্রথায় জর্জরিত এ কথা যদি সত্য হয়, ভণ্ডামি ও শঠতায় দেশ যদি ছাইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে যিনি এই মনুষ্যত্বহীন জাতিকে ‘আবার তোরা মানুষ হ’ বলিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ঠাঁহার দেশভক্তিতে কৃত্রিমতা থাকিতে পারে না।

ছিলাম বা কি, হরেছি এ কি !

সে কথা নাহি ভাবিয়া দেখি ;

নিজের দোষ দেখালে কেহ মারিতে যাই ধরে !

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমে যে আমরা আন্তরিকতার অভাব দেখিব তাহা বিচিত্র নহে।

এইরূপে তিনি দেশের প্রকৃত আত্মাটিকে জাগাইয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। আবার, যখন প্রয়োজন হইয়াছিল তখন উদ্দীপনার মদিরা দেশবাসীকে আকর্ষণ পান করাইয়াছিলেন। তিনি বন্ধুদের নিকট বলিতেন। “আমাদের দেশ এখন কুস্তকর্ণের গায় ঘুমাইতেছে। রামায়ণের কুস্তকর্ণকে জাগাইবার সময় প্রথমে তাহার নাসিকার মধ্যে নানাবিধ স্নগন্ধি দ্রব্য প্রবিষ্ট করাইয়া তারপর অন্তরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; আমিও প্রথমে সকলকে শুধু হাসাইবার জন্ত অনেক গান ও ‘বিরহ’ ‘ত্র্যহম্পর্শে’র গায় প্রহসন লিখিয়াছি, সেই সঙ্গে দেশকে আঘাতও করিয়াছি এবং পরে অন্তরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছি।”

দেশের মঙ্গল-কামনাই যে তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মূলমন্ত্র ছিল, তাহা আমরা তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হইতেই দেখাইতে চেষ্টা করিব। এই দেশানুরাগ যে তিনি তাঁহার নিজস্ব যুগ হইতে কিয়ৎ-পরিমাণে পাইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

‘দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দী’র জাতীয় জড়তা ও অবসাদের পর দেশ তখন ইংরাজী শিক্ষার ফলে আত্মচৈতন্যে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, এবং বঙ্কিম প্রমুখ নবযুগের সাহিত্যিকগণ অপূর্ব প্রভাতী গাহিয়া প্রথম জাগরণের শুভ মুহূর্ত্ত আনয়ন করিতেছিলেন। শেষ রজনীর ঘোরাঙ্ককার কাটিয়া গিয়াছিল। জননী তাঁহার ‘বিপুল নীড়ে ধীরে ধীরে জাগিতেছিলেন। সমাজে, ধর্মে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রে সর্বত্রই প্রবল চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

জাতীয় জীবনের এই স্মরণীয় সন্ধিক্ষণে বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব। হেম-নবীনের কাজ তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ; সাহিত্য-সূর্য্য বঙ্কিমচন্দ্র অন্তপারের চিন্তায় 'ধর্ম্মতত্ত্বে' অভিনিবিষ্ট ; এবং নব রবির কিরণালোকে বঙ্গ-গগনের প্রাচীদেশ উদ্ভাসিত। এই সময়ে বালক বিজেন্দ্রলাল তাঁহার অক্ষুট হৃদয়-কুমুমে গ্রথিত সঙ্গীতমালিকা 'আর্য্যগাথা' 'জননী বঙ্গভাষা'র 'অমল-চরণ-কমলে' নিবেদন করিলেন। ঊনবিংশ-বর্ষ-বয়স্ক তরুণ যুবক বিজেন্দ্রলালের প্রাণ তখন হইতেই দেশের দুর্দশা-স্মরণে কাঁদিত। তাঁহার এই প্রথম কাবোর ভূমিকায় তিনি লিখিতেছেন, 'যদি কাহারও অধঃপতিতা হতভাগিনী দুঃখিনী মাতৃভূমির নিমিত্ত নেত্রপ্রাস্ত কখন সিক্ত হইয়া থাকে, আর্য্যগাথা তাহারই আদর চাহে।"

বিলাতে অবস্থানকালে বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় গ্রন্থ ইংরেজী Lyrics of Ind প্রকাশিত হয়। সুদূর প্রবাসেও মাতৃভূমির জন্ম যে তাঁহার হৃদয় দুঃখ ও বেদনায় আকুল হইত, তাহা এই পুস্তকের প্রথম কবিতা The Land of the Sun হইতে আমরা দেখিতে পাই। কবি ভারত মাতার একটি অতি গৌরবোজ্জ্বল বর্ণনা দিয়া শেষে বলিতেছেন—

O my land, can I cease to adore thee,
Though to gloom and to misery hurled ?
O dear Bharat ! my beautiful maiden,
O sweet Ind ! Once the Queen of the world !

যদিও অঁধার দুঃখের বাবে নিপতিতা আমি ভূমি,
তথাপি কি অবহেলিতে তোমারে পারি গো জনমভূমি ?

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

তুমি যে একদা, হে মোর ভারত, আহিলে জগত-রাণী,
ওগো সুন্দরী ভারত, আমার ত্রয় নিকেতনখানি !

. And though wrecked is thy pride and thy glory,
Of it nothing remains but the name ;
Yet a beauty and sunshine still lingers,
And yet gleams through the midst of thy shame.

যদিও সে তব গৌরব যশ সকলি পেয়েছে লয়,
কিছু নাই আর এখন তাহার নামটুকু শুধু রয়,
তবুও সে তব লাজ কুহেলিকা ভেদিয়া দেখি যে আসে,
কি এক সুধমা—রবির কিরণ, এখনও নয়নে ভাসে !

বিংশ বৎসর পরে যে প্রদীপ্ত স্বদেশপ্রেম 'আমার দেশ' গানে এ দেশে
উদ্দীপনার বহি জ্বালিয়া দিয়াছিল, এই ইংরেজী কবিতাতে কি তাহারই
ক্ষুণ্ণ লক্ষিত হইতেছে না ?

বিলাত হইতে ফিরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে অস্বীকার করায় বিজেন্দ্রলাল
যখন একঘরে হইলেন, তখন তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ভীষণভাবে
হিন্দু সমাজকে আক্রমণ করিয়া 'একঘরে' নামক পুস্তিকা লিখিলেন। এই
পুস্তক উপলক্ষ করিয়া তাঁহার দেশপ্ৰীতিসম্বন্ধে অনেক বাগবিতণ্ডা
হইয়াছে বলিয়া আমরা ইহার সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা করিব।
ইহার ভাষা যে অত্যন্ত তীব্র, তাহা লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।
নিদর্শন-স্বরূপ আমরা শেষ কর ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"হিন্দু-সমাজ পচিতেছে—পৃথিবীর লজ্জা, মনুষ্যজাতির আবর্জনা, পরাজিত,
অস্বাস্য, পদাহত হিন্দুজাতি আজ পচিতেছে।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

শঠতার ভাৱ, মিথ্যা কথাৰ ওতাদ, লুকোচুরিৰ সৰ্দাৰ, ভীৰুতাৰ সেনাপতি, হিন্দুজাতি আজ পঢ়িতেছে।”

এই ভীৰুতাৰ সহিত কোন কোন স্থলে ব্যঙ্গ মিশ্ৰিত হইয়াছে। একস্থলে আছে—

‘পেয়াদা বশুৱালয়ে যাইব বলিলে যেমন তাহাকে মাৰিতে ইচ্ছা করে, কেই তাঁহাৰ ঘোৱতাৰ কৃষ্ণবৰ্ণা স্ত্ৰীকে প্ৰেয়সী বলিয়া ডাকিলে অপৰেৰ যে যাতনা হয়, হিন্দুকে আজ জাতি বলিলে আমাৰ তেমনি শৰীৰে বেদনা হয়।’

কিন্তু তিনি হিন্দুজাতি ও সমাজেৰ উপৰ যে এত গালিবৰ্ষণ কৰিয়াছিলে—

“তাঁহা বিদ্বেষে নহে, শত্ৰুভাবে নহে; আতাৰ প্ৰতি আতাৰ যে ক্ৰোধ, অস্তাৰ-ব্যবহাৰী পিতাৰ প্ৰতি পুত্ৰেৰ যে ক্ৰোধ সেই ক্ৰোধে।”

তিনি এই ভীৰু ভাষা প্ৰয়োগ কৰিয়াছিলে। হিন্দুসমাজ তপাষি, ও শঠতাৰ পূৰ্ণ বলিয়া তাঁহাৰ মনে হইয়াছিল। সকল প্ৰকাৰ দুষ্কৰ্ম এ সমাজে অনুষ্ঠিত হইতেছে; কিন্তু পাপী দুৰাচাৰদিগকে সমাজ শাসন কৰে না। আৰ কে কাহাকে শাস্তি দিবে? সমাজেৰ প্ৰাৰ সকলেই যে এই বকম। ইহাৰা বিলাতফেৰতাদিগকে একঘৰে কৰিবে; কিন্তু নিজেৰা “ৰুদ্ধ কবাটে মূৰগীৰ কোল খাইয়া বাহিৰে আসিয়া অমাৰিক মিছা কথা কহিয়া পুণ্যসঞ্চয়” কৰিবে। আত্মাভিমানকুণ্ড বিজেদ্ৰলাল হৰত জায়েৰ মৰ্যাদা ঠিক ৰাখিতে পাৰেন নাই। কিন্তু তিনি যে স্বজাতিদ্ৰোহী ছিলেন না, পৰন্তু দেশেৰ মঙ্গলকামনাই তাঁহাৰ এই আক্ৰমণেৰ মূলে নিহিত ছিল তাহাৰ প্ৰমাণও এই পুস্তকেই ৰহিয়াছে। তিনি বলিতেছেন—

“একঘৰে কৰিতে চাহেন, আনুন আজ যে-সব বিবৰ সমাজেৰ অমঙ্গলেৰ হেতু তাহাৰদিগকে একঘৰে কৰি। আনুন আজ বলি, যে শঠতা কৰিবে, মিছা কথা কহিবে

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

তাহাকে একঘরে করিব; যে পক-বর্ষা বালিকার বিবাহ দিবে তাহাকে একঘরে করিব; যে যুবতী বিধবার স্বেচ্ছিত বিবাহে বাধা দিবে তাহাকে একঘরে করিব ; আনন্দ, যে সব ব্যাধি জাতির বুকে বসিয়া অবাধে বুকের রক্ত পান করিতেছে, যাহারা নির্ভয়ে উল্লতির, প্রেমের, সত্যের হৃদয়ে শেল বিধিতেছে তাহাদিগকে একঘরে করি। সে 'একঘরে'তে দেখিবেন দেশের মঙ্গল হইবে, জাতির জীবন ফিরিবে। সে একঘরের অর্থ অর্থের প্রতি সমাজের কেন্দ্রীভূত ঘৃণা ও ক্রোধ ; সে একঘরের অর্থ অর্থের উচ্ছেদ ; জ্ঞানের, সত্যের, উল্লাসের নবরাজ্য। নইলে যেখানে কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী একঘরে সেখানে একঘরেতে কেহ ভীত হইবে না। সে একঘরের অর্থ বিদ্যা, প্রতিভা, সত্য, স্মরণ, ধর্ম।

পূর্বেই বলিয়াছি যে এই 'একঘরে' পুস্তিকায় আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গশক্তির প্রথম পরিচয় পাই। ইহাই এখন তিনি সমাজবাধির প্রতিকারের চেষ্টায় নিয়োজিত করিলেন। তাঁহার ভাষা আর কখনও ভীত হয় নাই। এখন হইতে তিনি সকলকে কেবল হাসাইতে লাগিলেন। সেই হাসিতে কোন সঙ্কীর্ণতা বা অসুদারতা ছিল না। সেই হাসির শ্রোতে জাতীয় চরিত্রের মলিনতা ধৌত করিয়া ফেলাই তাঁহার বাসনা ছিল।

অল্পদিন পরেই তিনি 'কঙ্কি-অবতার' নামে এক প্রহসন রচনা করিলেন। ইহাতে তিনি হিন্দুসমাজের অন্তর্গত সমস্ত সম্প্রদায়কেই হাস্যাস্পদ করিয়াছেন। 'বিলেতফেরৎ, ব্রাহ্ম, গৌড়া, পণ্ডিত, নব্যহিন্দু'—ইহাদের কাহাকেও তিনি ছাড়িয়া কথা বলেন নাই। বিশ্বকর্মা ব্রহ্মার নিকট বিলেতফেরতাদের এইরূপ পরিচয় দিতেছেন—

বিলেতফের্তা নামক আর এক সম্প্রদায় হইবে ; তাহার! ভিতরে সাহস প্রভৃতি সমৃদ্ধ ও বাহিরের বর্ণ তিন্ন সব বিষয়ে সাহসদিগের বেশ আনা মাত্রার অনুবর্তী

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

হইবে। তাহার। ধূতি চাদর নিবিদ্ধ বিবেচনা করিয়া বাড়োতে পাজামা ও বাহিরে হ্যাটকোট পরিয়া আশ্চর্যবিশেষত্ব অনুভব করিবে। তাহ্মলচর্ষণ, গুড়গুড়িতে ধূমপান, গুরুজনকে শ্রগাম—এক কথায়—সমস্ত দেশায় রীতিনীতির প্রতি তাহাদের দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিবে। তাহার। মাতৃভাষায় কথা কহিতে কুণ্ঠিত হইবে ; এবং কেবল কুলি-সম্প্রদায়ের সহিত এড়া ভাষায় বাঙ্গালী হিন্দী কহিতে সক্ষম হইবে। তাহার। ইংরাজী শ্যাং প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিবে ; ইংরাজী সুরে শিষ দিবে ; ছাঁড় ঘুরাইয়া বীরদর্পে চলিবে ; হইস্কি খাইবে এবং পদদ্বয় যতদূর সম্ভব দ্বিধা প্রসারিত করিয়া চুরোট টানিবে।’

কয়েক বৎসর পরে তাঁহার এই উক্তিই “আমাদের বিলেতফের্তা ক’ভাই” নামক হাসির গানে রূপান্তরিত হইয়া সর্বজনবিদিত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের এই উক্তি সকল বিলেতফেরতার প্রতিই প্রযোজ্য নয়, এবং বাহ্য লক্ষণ মাত্র দেখিয়াই মানুষকে সব সময় বিচার করাও চলে না। আর এই শ্রেণীর বিলেত-ফেরতা ও আজকাল আর বড় দেখা যায় না।

অতঃপর দ্বিজেন্দ্রলাল যে-সকল ব্যঙ্গ কবিতা ও হাসির গান লিখিতে লাগিলেন, সেগুলি সকলের এতই পরিচিত যে এ প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলে। ব্যঙ্গের অন্তরালে বেদনা, হাশ্বের সহিত অশ্রু রেখা এই গানগুলিতে তাঁহার অকপট স্বদেশপ্রেমিক হৃদয়টিকে দেশের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। তিনি এখন আর নিজেকে তাঁহার স্বদেশ-বাসিগণ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করেন না! দেশের দুঃখ, দৈন্য, লজ্জা, এমন কি তাহার দোষসমূহেরও তিনি অংশভাগী, সুতরাং তিনি বাহাদিগকে ব্যঙ্গ করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে তিনি নিজেও একজন, তাহা তিনি বিশ্বাস্ত হন নাই, এবং বিক্রপকারী ও বিক্রপের বস্তু এই উভয়ের মধ্যে যে কোন পার্থক্য বা ব্যবধান নাই তাহা তিনি অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

করিয়াছেন। তাই তাঁহার রসকোঁতুকপূর্ণ অথচ ব্যঙ্গমূলক হাসির গাম লোকের এত প্রিয় হইয়াছে।

কিন্তু শুধু দোষ দেখাইয়া কি ব্যঙ্গ করিয়া দেশের যে-হিতসাধন করা যায় তাহা আংশিক মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে জাতিকে নূতন ভাব দিতে হইবে এবং যদি তাহার গৌরব করিবার কিছু থাকে, তাহাকে তাহা স্মরণ করাইয়া তাহার পদদলিত অবমানিত প্রাণে আত্মমর্যাদা উদ্দীপিত করিয়া দিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত দেশভক্তের কাজ। দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা বুঝিতেন। তাই যখন তিনি দেখিলেন যে ব্যঙ্গবিজ্রপ যথেষ্ট হইয়াছে, তখন তিনি ভারতগৌরব রাজপুত জাতির ইতিহাস হইতে স্বদেশপ্রেম ও মনুষ্যত্বের মহোন্নত আদর্শ বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে উজ্জলভাবে ধরিয়া 'রাণা প্রতাপ', 'হুর্গাদাস,' ও 'মেবার পতন,' নামক নাটকত্রয় রচনা করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল হয় নাই। এই নাটকগুলি রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়া শত সহস্র বাঙ্গালীর প্রাণে যে উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার বহুয় জাতীয় চরিত্রের অনেক পঙ্কিলতা ধোঁত হইয়া গিয়াছে।

(২)

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, তিনি হুঃখবাদী (Pessimist) ও ঈশ্বরবিশ্বাসহীন ছিলেন। আমরা তাঁহার এ মন্তব্য ব্রাহ্ম বলিয়া মনে করি। যিনি 'পরপারে' নাটক লিখিয়াছেন, এবং

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

মহাসিদ্ধুর ও-পারের সঙ্গীতের আভাস পাইয়াছিলেন, তিনি কখনও নাস্তিক হইতে পারেন না! তবে এক সময়ে হয়ত তিনি অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) ছিলেন। ‘মস্ত্রের’ একটি কবিতায় তিনি বলিতেছেন—

“মরণের পাছে
কি জগৎ লুকায়িত আছে।
এই কৃষ্ণ জলধির পারে
কোন দেশ আছে! * *
কিংবা এইখানে শেষ সব।”

কিন্তু তিনি প্রথম ও শেষ জীবনে যে ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার রচনাবলীতেই রহিয়াছে। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘আর্য্যগাথা’র ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন—“যদি কেহ প্রকৃতিকে দেখিতে দেখিতে কখন কখন প্রকৃতি-রচয়িতার অনন্ত মাহিমায় স্তব্ব হইয়া থাকেন * * * ‘আর্য্যগাথা’ তাঁহারই আদর চাহে।” ইহা কি অবিশ্বাসীর কথা? যদি কেহ বলেন যে তরুণ যৌবনে তাঁহার এরূপ ভাব থাকিলেও পরে একেবারে তাহা পরিবর্তিত হইয়াছিল, তদন্তরে ‘মেবার পতন’ নাটকের ভূমিকা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি বলিতেছেন,—‘আমি’ হইতে ষতদূর প্রেমকে ব্যাপ্ত করা যায়, ততই সে ঈশ্বরের কাছে যায়। ঈশ্বরে লীন হইলে সে প্রেম পরিপূর্ণতা লাভ করে। সেই ঐশ-প্রেম এখানে দেখানো হয় নাই। নাটকান্তরে তাহা দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।” যিনি ঐশ-প্রেমের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য নাটক পর্য্যন্ত লিখিবার কল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি যে ঈশ্বরে আস্থাহীন ছিলেন, এরূপ কথা কি করিয়া মানিয়া লওয়া যায়? মনে রাখিতে হইবে, ‘মেবার পতন’.

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

দ্বিজেন্দ্রলালের পরিণত বয়সের রচনা। সুতরাং যদি বা কোন সময়ে তাঁহার মনে ঈশ্বর বা পরকাল সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে, সে সংশয় যে স্থায়ী হয় নাই তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। তবে এ কথা সত্য যে তিনি লৌকিক হিন্দুধর্মের স্বর্গ, নরক, দেবদেবী ইত্যাদি বিশ্বাস করিতেন না, এবং তাঁহার মধ্যে ভক্তিভাবটা বোধ হয় তেমন প্রবল ছিল না। কিন্তু ইহা যে নাস্তিকতার লক্ষণ, তাহা অবশ্য কেহই বলিবেন না। কারণ, অনেক শিক্ষিত হিন্দুই স্বর্গ, নরক, দেবদেবী প্রভৃতিকে কবিকল্পনা মাত্র বলিয়াই মনে করেন, ঈশ্বর-বিশ্বাসের সহিত ইহাদের সম্বন্ধে তাঁহার স্বীকার করেন না।

ভক্তির অভাববশতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল আধ্যাত্মিক কবিতা রচনা করেন নাই, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কারণ, তাঁহার মৃত্যুর দেড় বৎসর পূর্বে 'বাণী' পত্রিকায় তাঁহার যে একটি গান প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা শুধু আধ্যাত্মিক নহে, তাহার প্রেমগদগদ আত্মসমর্পণের ভাবটি এমনই মধুর যে এখানে সেটির কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। গানটি এই—

“তুমি যে আমার হৃদয়েখর
তুমি যে প্রাণের প্রাণ ;
কি দিব তোমায়, যা আছে আমার
সকলি তোমারই দান ।
চরণের লঘু ভঙ্গিম গতি,
হৃদয়ের বেগ কম্পিত অতি,
অধরের হাসি নয়নের জ্যোতি,
কাণের মুছ গান ;

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

সকলি তোমারই দান—সে যে মথা

সকলি তোমারই দান ।

* * * * *

চেয়ে দেখ ঐ সন্ধ্যা আকাশে
দিবসের আলো ম্লান হয়ে আসে,
মিশে যায় আশা হতাশের খাসে,
থেমে যায় হাসি গান ;
ফুরিয়ে গিয়াছে যা ছিল আমার,
আর কেন বঁধু—চেয়োনাকো আর,—
আর কিছু নাই তোমায় দ্বিবার,
হ'ল দিবা অবসান ;
আর কেন বঁধু ?—লহ লহ তবে
এ জীবন বলিদান ।”

দ্বিজেন্দ্রলাল আর কোন ভগবদ্-বিষয়ক গান বা কবিতা রচনা করিয়াছেন কি না তাহা জানি না। কিন্তু এই একটি গানেই তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ও ভক্তি তাঁহার ‘প্রাণের প্রাণ’ ‘হৃদয়েখরের’ দিকে উচ্ছ্বসিতবেগে ছুটিয়া গিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল যে দুঃখবাদী ছিলেন না তাহা তাঁহার কাব্য ও প্রবন্ধ হইতে প্রদর্শিত হইতে পারে। একটি কবিতায় তাঁহার নবজাত সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি বলিতেছেন—

“এস ধরাধামে বৎস । হেথা বিশ্বময়
সর্ব্বের কদম্ব্য নহে । নহে সমুদয়
ঋতিকা, অশ্রান্তগর্জি বহু, অন্ধকার,
কণ্টক, অরণ্য, শুক মরুভূমি সার ।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

আছে উর্ধ্বে নীলাকাশ—শাস্ত্র দিব্য স্থির,
অনন্ত অভয় ভরা স্নিক সুগভীর
স্নেহে বন্ধে ধরি' ধরণীতে । * *
নহে সবই কালসর্প কীট ও কণ্টক,
নহে সবই প্লীহা, যক্ষ্মা, জ্বর, বিস্ফোটক
হেথা।—আছে বিখে নব শৈশবের মত্ত
উচ্ছ্বাল ক্রোড়া, যোবনের চিরস্বপ্ন—
প্রেমের রাজত্ব, বার্কিকোও ক্ষীণ আশা ;
আছে চিরপবিত্র মাতার ভালবাসা,
চির প্রবাহিত নিখরৈর ধারাসম
অবারিত, উৎসারিত, নিত্য মনোরম.
চিরস্নিক ; সেই স্নেহ কভু নাহি যাচে
প্রতিদান । হেথা দুঃখ আছে, সুখ আছে,
মিথ্যা আছে, সত্য আছে, উদ্বেগ ও ভয়
আছে ; শাস্তি ও ভরসা আছে । বিশ্বময়
সব স্থানে ঠুং মধ্যে ধাত্ত আছে । তবে
শুধু সেইটুকু বৎস বেছে নিতে হবে ।”

ইহা দুঃখবাদীর উক্তি নহে । অপর একটা কবিতায় তিনি
বলিতেছেন—

“কে চাহে করিতে ত্যাগ এমন ধরণী,
এমন জগৎ আমাদের ?”

আর যিনি পৃথিবীর সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া গাহিয়াছেন—

“একি মধুর ছন্দ, মধুর গন্ধ, পবন মন্দ মন্দর—
একি মধুর মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ পত্রপুঞ্জ মর্দর ।”

তিনি কখনও দুঃখবাদী হইতে পারেন না ।

গীতাঞ্জলির ভাবধার ।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি কথা মনে পড়িতেছে । দ্বিজেন্দ্রলাল একবার রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত ব্যাখ্যার সমালোচনা করিতে গিয়া তাঁহাকে দুঃখবাদী বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন । সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি নিজে পৃথিবী দুঃখময় মনে করিতেন না । এই প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন—“পৃথিবীর সম্বন্ধে মানুষের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা কবিত্বজনোচিত কি না বলিতে পারি না । * * * আমি তা বিবেচনা করি যে মর্ত্যের মানুষ একটা মহামহিমাবিত সৃষ্টি । সে ধুলির উপর দাঁড়াইয়া সদর্পে সূর্যের পানে চাহিয়া বলিতে পারে—‘তুমি সূর্য্য বটে, কিন্তু মানুষ নও ।’ মানুষের স্নেহ, দয়া, কৃতজ্ঞতা, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের ত্যাগ পরম সুন্দর । তাহার কাছে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত ছাড়া ।”*

রবীন্দ্রনাথকে দ্বিজেন্দ্রলাল ভুল বুঝিয়াছিলেন । যিনি দুঃখকে ঈশ্বরের মূর্তিরূপে কল্পনা করিয়া গাহিয়াছেন—

“দুঃখের বেশে এসেছ বলে’
তোমারে নাহি ডরিব হে,
যেথায় ব্যথা সেথায় তোমা
নিবিড় ক’রে ধরিব হে ।”

তিনি দুঃখবাদী নহেন । দেবকুমার বাবুও দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষ অন্তরঙ্গ এবং ভক্ত হইয়াও তাঁহার সম্বন্ধে ভুল করিয়াছেন ।

* “অর্চনা,” ১৩১৭ সাল ।

জীবন-চরিতে দ্বিজেন্দ্রলাল

জীবনচরিত হইতে কবিকে সব সময়ে যে চিনিতে পারা যাহা তাহা নহে। টেনিসনের জীবনচরিত পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,— “কবি কোথায়, কাব্যশ্রোত কোন্ গুহা হইতে প্রবাহিত হইতেছে তাহাত খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবনচরিত নহে। আমরা বুঝিতে পারিলাম না কবি কবে মানবহৃদয়-সমুদ্রের মধ্যে জাল ফেলিয়া এত জ্ঞান ও ভাব আহরণ করিলেন এবং কোথায় বসিয়া বিশ্বসঙ্গীতের সুরগুলি তাঁহার ধীশীতে অভ্যাস করিয়া লইলেন।”—ইহার কারণও তিনি দিয়াছেন। “কবি কবিতা যেমন করিয়া রচনা করিয়াছেন জীবন তেমন করিয়া রচনা করেন নাই। তাঁহার জীবন কাব্য নহে।”

কিন্তু তাই বলিয়া কি কবির জীবনচরিতের কোন প্রয়োজন নাই? আমরা মনে করি, আছে। কিন্তু তাহা :এরূপ হওয়া চাই যে কবির জীবন ও তাঁহার কাব্যের মধ্যে যদি কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে তাহা যেন আমাদের বুঝাইয়া দিতে পারে। যে জীবনচরিত একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির কাহিনীমাত্র, যাহা কবির জীবনযাত্রা-সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল মাত্র চরিতার্থ করে, তদধিক কোন মহত্তর সত্যের সন্ধান দিতে পারে না, তাহার কোন মূল্য নাই।

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনচরিত পড়িয়াও আমরা নিরাশ হইয়াছি। যে সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে কবির কার্য-কলাপের সুসঙ্গত, অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা ও তাঁহার

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

অসাধারণ চিত্তের বিকাশ ও পরিণতি প্রদর্শন সম্ভবপর হয়, তাহার অভাবে দেবকুমার বাবুর গ্রন্থখানি কেবল অনাবশ্যক আলোচনার এবং অসার বাগাড়ম্বরে ভারাক্রান্ত হইয়াছে। এই সব বাগ্‌জালের মধ্য হইতে আসল খাঁটি কবিটিকে চিনিতে পারা একরূপ প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। আবার তাঁহার সম্বন্ধে যে সব গল্প পুস্তকে বর্ণিত দেখিতে পাই, সেগুলির অধিকাংশই একরূপ তুচ্ছ যে, সে সব গল্প একজন অতি সাধারণ ব্যক্তির সম্পর্কেও বলিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

হ' একটি উদাহরণ দিই। দ্বিজেন্দ্রলাল বালাকালে একদিন তাঁহার অগ্রজকে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতে শুনিয়া নিজে শব্দরূপ আওড়াইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে ভবিষ্যতে একজন খুব মেধাবী পুরুষ বলিয়া পরিচিত হইবেন. তাহার আভাস এইখানেই পাওয়া গেল।

আর একটি গল্প এই যে, আলিপুরে তিনি যখন ট্রেজারি অফিসার ছিলেন, তখন একদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাছারিতে থাকিয়া পেন্সনপ্রাপ্ত বৃদ্ধগণ যাহাতে সেইদিনই তাঁহাদের পেন্সন পান তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং বৃদ্ধদের প্রতি যে তিনি কত দয়ালু ছিলেন, জীবনচরিত-লেখক তাহার প্রমাণ পাইলেন।

যৌবনে দ্বিজেন্দ্রলাল একবার একটা প্রদর্শনীতে কয়েকজন ফিরিঙ্গি কর্তৃক কয়েকটি বঙ্গমহিলাকে অপমানিত হইতে দেখিয়া ছুরাখাদিগকে কিরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন" দেবকুমার বাবু তাহার এক পঞ্চপৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণনা দিয়াছেন। যাহার উল্লেখমাত্রই যথেষ্ট হইত, তাহাকে একটি খণ্ড-যুদ্ধের আকার দান করিয়া লেখক দ্বিজেন্দ্রলালের স্তায় অসাধারণ ব্যক্তির গৌরবহানিই করিয়াছেন। কারণ, বেরূপ অবস্থায় তিনি ফিরিঙ্গি

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

দিগের সৃষ্টিত লড়াই করিয়াছিলেন সেরূপ অবস্থায় নিতান্ত কাপুরুষ ব্যতীত কেহ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না।

এবংবিধ গল্পে দ্বিজেন্দ্রলালের যথাযথ পরিচয় পাওয়া যায় না। আমাদের এই অধঃপতিত, অবজ্ঞাত দেশে এমন একজন সাহিত্যিক আবির্ভূত হইয়াছিলেন যাহার পৌরুষ, তেজস্বিতা, দৃঢ়তা, আন্তরিকতা ও সর্বোপরি স্বদেশ-প্রেম সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া জাতীয় চরিত্রের উন্নয়নে নিয়োজিত হইয়াছে, যাহার হাসি ও অশ্রু আলোকোজ্জ্বল মুক্তাফলের ন্যায় বঙ্গভাষার বক্ষে ঝলমল করিতেছে, যাহার উচ্ছ্বসিত সঙ্গীতধারা, উদ্দীপনার প্রবল প্রবাহ সৃষ্টি করিয়া জাতীয় জীবনকে সুন্দর এবং সাহিত্যক্ষেত্রকে স্নিগ্ধ সরস করিতে কার্পণ্য করে নাই, যিনি নানা দুঃখপীড়িত নিরানন্দ বাঙ্গালীজাতিকে অনাবিল আনন্দ-রসে ডুবাইতে জানিতেন, আবার উচ্চ আদর্শের প্রবলোকে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া জাতীয় তরুণী বাহিয়া চলিতেও শিক্ষা দিয়াছেন।

আমাদের সৌভাগ্য যে, দেশ যখন নব্যযুগের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত, যখন সমাজে ও সাহিত্যে এই নব্য জাগরণের একটা বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, তখনই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার দেশের তথা জননী বঙ্গভাষার পৌরোহিত্যে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে শুধু কবি বা ভাবুকরূপে দেখিলে বোধ হয় তাঁহার প্রতি ঠিক স্মৃতিচার করা হয় না। কারণ, তিনি কবিত্ত্ব বা ভাবুকতার যত বড়, দেশহিতৈষণায় তিনি তদপেক্ষা বেশী বড়। সত্য বটে, জননী বঙ্গভাষার 'অমল চরণ' কমলে স্থান লাভের জন্য তিনি তাঁহার সেবা করিতে কোনরূপ ক্রটি করেন নাই, কিন্তু তাহা

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

হইলেও সাহিত্য তাঁহার হস্তে স্বদেশ-মন্ত্র সাধনের যজ্ঞ বা অস্তস্বরূপ ছিল, বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের গায় একাগ্র সাধনার সামগ্রী ছিল না ;—দেশই ছিল তাঁহার ‘সাধনা,’ তাঁহার ‘দেবী’, তাঁহার ‘স্বর্গ’। স্মৃতরাং সাহিত্য-সৃষ্টি বিষয়ে তিনি যদি বঙ্কিম-রবীন্দ্রের সমকক্ষ বিবেচিত না-ও হন, যদি তাঁহার নাটকগুলির অধিকাংশ সাহিত্য হিসাবে উৎকৃষ্ট না-ও হইয়া থাকে, পরন্তু লোকশিক্ষাই যদি সেগুলির পরম উদ্দেশ্য ও চরম সার্থকতা হয়, তাহা হইলেও আক্ষেপের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু দেশাত্মবোধ তাঁহার সাহিত্যে কত খানি মূর্তিলাভ করিয়াছে, বঙ্কিমের বন্দে মাতরং মন্ত্র এবং রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দীপনা মিলিত হইয়া জাতীয় আন্দোলন-ধারাকে যে ত্রিধারঃ-সঙ্গমের মাহাত্ম্য দান করিয়াছে, তাহাতে দ্বিজেন্দ্রলালের গৌরব ও কৃতিত্ব কতখানি—ইহারই বিচার দ্বিজেন্দ্র লালের জীবনালোচনায় সর্বাপেক্ষা বড় কথা।

কিন্তু তাঁহার জীবনচরিতকার এদিক দিয়া তাঁহার জীবন-পর্যালোচনা না করিয়া তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথের গায়ই প্রতিভাসম্পন্নরূপে আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। একস্থলে দেবকুমার বাবু লিখিয়াছেন,— যখন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের এই দুই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক—দিবাকর রাব ও দ্বিজরাজ চন্দ্রমা সতত এইরূপে নিয়মিতভাবে সম্মিলিত হইতেন, যখন তাঁহারা উভয়ে নবনবোন্মেষশালিনী, বিশ্ববিজয়িনী অপূর্ব শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবিশ্বয়-সঞ্জাত অনুরাগে একে অন্নের প্রতি আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন, এই ভাগ্যহত দেশের পক্ষে তাহা কি গৌরবের ও আনন্দের দিনই না ছিল! অত বড় দুইটি প্রতিভার একত্র সম্মিলন ঘটিলে একের পক্ষে অন্নের নিকট হইতে

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

শক্তির সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত অনিবার্য এবং নিতাস্তই স্বাভাবিক।”

এই মন্তব্য নিতাস্ত অসঙ্গত ও অসমীচীন। কারণ, যে সময়ের কথা লেখক এখানে বলিতেছেন সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভালোকে দেশবাসীর নয়ন ঝলসিয়া দিতেছিলেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের তখন পর্য্যন্ত ‘হাসির গান,’ ‘আষাঢ়ে,’ ‘মঙ্গ্র’ ও ছই একখানি নাটক-প্রহসন ব্যতীত আর কিছুই রচিত হয় নাই। তিনি তখনও ‘হাসির গানের কবি’ বলিয়াই পরিচিত। সুতরাং তিনি রবীন্দ্রনাথেরই ঞ্চয় প্রতিভাসম্পন্ন, (“অত বড় ছইটি প্রতিভা”) উভয়েরই শক্তি “বিশ্ববিজয়িনী”, শুধু তাহাই নহে, পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান “একান্তই অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল”, এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া লেখক অত্যন্ত বিচারমূঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন।

উত্তরকালে যখন দ্বিজেন্দ্রলালের যশোরশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তখনও শুধু রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিভা বিশ্ববিজয়িনী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের নয়। আর “একের পক্ষে অন্নের নিকট হইতে শক্তির সাহায্য গ্রহণ” করা সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে উভয়েই ভঙামি ও গোড়ামির ঘোর শত্রু ছিলেন, এবং উভয়েই নানাবিধ সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাবের আদান প্রদানের কথা উঠিলে ব্যাপারটা অত্যন্ত হাস্যকর হইয়া দাঁড়ায়।

রবীন্দ্রনাথ উদীয়মান দ্বিজেন্দ্রলালের “আষাঢ়ে” ও “মঙ্গ্র” কাব্যদ্বয়ের প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করিয়া সাহিত্য-সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা লাভের পথ সুগম করিয়া দেন। তিনি যে দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা কোনপ্রকারে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন এরূপ কথা অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

দ্বিজেন্দ্রলালের উপরও যে রবীন্দ্রনাথের খুব বেশী প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল এমন কথাও বোধ হয় বলা যাইতে পারে না। কারণ, তাঁহার রচনাবলীতে রবীন্দ্র-প্রভাবের প্রমাণ অধিক পাওয়া যায় না।

কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা দ্বিজেন্দ্রলালকে খর্ব করিতে চাহি। আমরা শুধু এই কথা বলিতে চাহি যে তাঁহার মহৎ শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৃজনে নহে, সাহিত্যের দ্বারা স্বদেশ-সেবার; ভাবরাজ্যের মণিমুক্তা আহরণে নহে, সমাজে প্রাণ-শক্তির সঞ্চার-চেষ্টায়। ইহাও কি কম গৌরবের কথা?

বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার সমসাময়িক বঙ্কিম-চন্দ্রের তুল্য মর্যাদা কখনই লাভ করেন নাই, কিন্তু সমাজ-সেবার ও দেশের কল্যাণে আত্মোৎসর্গের জন্য কাহার গৌরব-বেশী? শুধু আনন্দদান ও তৎসহ চিরন্তন সত্যের প্রচারের জন্য যতটা না হটক, সাহিত্যকে দেশসেবা ও লোকশিক্ষার বাহন করাতেই তাঁহার সমধিক কৃতিত্ব।

এখানে হয়ত প্রশ্ন হইবে, উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য কি প্রথম শ্রেণীর হইতে পারে না? এরূপ ব্যাপার যে একেবারে অসম্ভব, তাহা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু দেখা গিয়াছে, প্রথমশ্রেণীর প্রতিভাও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়া নিজেকে পশু করিয়া ফেলিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রেরই নাম করা যাইতে পারে। তাঁহার “আনন্দ মঠ” বা ‘দেবী-চৌধুরাণী’ যে সাহিত্য-হিসাবে ‘বিষবৃক্ষ’ বা ‘কৃষ্ণকাস্তুর উইল’ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর তাহা অস্বীকার করা চলে না। দ্বিজেন্দ্রলালেরও ‘শাজাহান,’ ‘নূরজাহান’ প্রভৃতি যে দু’একখানি উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ নাটকাদি আছে, সেগুলি তাঁহার উদ্দেশ্যমূলক ‘হর্গাদাস’ বা ‘যেবার পতন’ অপেক্ষা

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

উৎকৃষ্ট। ইহার কারণ ও বৃদ্ধিতে পারা যায়। শ্রেষ্ঠ প্রতিভার ধারাই এই যে যখন তাহা অব্যাহত থাকে, তখনই তাহার মাহাত্ম্য পূর্ণ প্রকটিত হয়, সচেষ্ট বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিলেই তাহার শ্রেষ্ঠতা নষ্ট হইয়া যায়। ইহার প্রেরণা কবির অন্তরবাসিনী এক রহস্যময়ী শক্তি হইতে আসে, দেশকালের প্রয়োজন ইহাকে পূর্ণমাত্রায় অনুপ্রাণিত করিতে পারে না, উদ্দেশ্যের গভীরমধ্যে ও নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। তাই শ্রেষ্ঠ প্রতিভা যাহা, তাহা চিরদিনের, তাহা অক্ষয়; কিন্তু বহিঃপ্রেরণাসঞ্জাত উদ্দেশ্য-মূলক সাহিত্য চিরন্তন নহে, তাহা তাহার সাময়িক কার্য সম্পাদন করিয়াই প্রায় গৌরবহীন হইয়া পড়ে, হয়ত বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যায়।

দেশের কল্যাণ-কামনাই যে বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-সেবার মূল মন্ত্র ছিল তাহা প্রবন্ধান্তরে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এই দেশ-হিতৈষণাই তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতায় প্ররোচিত করিয়াছিল। তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন যে; রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতা ও গান ছর্নীতিমূলক এবং তাঁহার অস্পষ্ট কবিতাগুলি শ্রেষ্ঠ কবিত্বের দাবী করিতে পারে না,—শুধু নব্য কবি-সম্প্রদায়ের সম্মুখে কবিত্বের একটা ভ্রান্ত আদর্শ প্রচার করিতেছে। সুতরাং তাঁহার পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করা অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই ব্যাপারটি হইতে আমরা তাঁহার সাহিত্যিক ও চরিত্রগত দোষগুণ উভয়ই কিয়ৎ পরিমাণে দেখিতে পাই। একদিকে যেমন তাঁহার উদ্দেশ্যের সাধুতা ও আন্তরিকতা সন্দেহ করিবার কারণ নাই, অপর দিকে তেমনই আবার সাহিত্য-বিচার সন্দেহে তাঁহার সঙ্গীর্ণতা ও ভ্রান্তি তাঁহারই কবি

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

জীবনকে বিড়ম্বিত করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের যে সব কবিতা ও গান
ষিঞ্জেন্দ্রলাল দুর্নীতিমূলক বলিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন, আমরা সেগুলি
নির্দোষ বলিয়া মনে করি, এবং তাঁহার বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার অপবাদও
বিচারসহ নহে। এ সম্বন্ধে এত বেশী আলোচনা হইয়া গিয়াছে যে
এখানে কিছু বলা আবশ্যিক মনে করি না। কিন্তু দেবকুমার বাবু এ
সম্বন্ধে নিজের স্বাধীন মত ব্যক্ত না করিয়া যেরূপভাবে বিষয়টির অবতারণা
করিয়াছেন তাহা একেবারেই সঙ্গত হয় নাই। তাই দু'এক কথা
বলিতে হইতেছে।

বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক সেন্টস্বেরি তাঁহার *History of English Literature in the Nineteenth Century* নামক পুস্তকে
লিখিয়াছেন, “গীতি-কবিতার যঁাহারা অর্থকেই প্রাধান্য দেন, তাঁহাদের
নিকট ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সর্বশ্রেষ্ঠ কয়েকটি কবিতা এবং শেলীর অনেক
কবিতা সমাদৃত হইবে না, কিন্তু তাহা হইলেও এই সকল কবিতাই ইংরাজি
সাহিত্যের গৌরব।” রবীন্দ্রনাথের অস্পষ্ট কবিতাগুলি সম্বন্ধেও আমরা
এই কথা বলিতে চাই। এমন অনেক রহস্যময় ভাব আছে—

“জীবনে যা চিরদিন র'য়ে গেছে আভাসে,
প্রভাতের আলোকে যা ফোটে নাই প্রকাশে।”

এই সকল ক্ষণিক উপলিক অথচ গভীর সত্যকে কবি যখনই ভাষার বাধিতে
চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই তাহা অস্পষ্ট ও শুধু ঈঙ্গিতময় গানের সৃষ্টি
করিয়াছে। কখনই

“কথা তারে শেষ করে' পারে নাই বাধিতে,
গান তারে সুর দিবে পারে নাই সাধিতে,”

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

তাহা হইলেও কালের কষ্টিপাথরে 'চিত্রাঙ্গদা' অকুরান সৌন্দর্য্য ও আনন্দের ঋনিস্বরূপ হইয়া বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডার চির সমৃদ্ধ করিয়া রাখিবে, আর যে সকল প্রেমের গান তিনি অভিসার-সঙ্গীত বলিয়া সাহিত্য হইতে নির্বাসিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, সেগুলিও চিরকাল আমাদেরই তরুণ-তরুণীর "পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান" এর গীতরূপে তাহাদের দাম্পত্য জীবনকে মধুর ও সুন্দর করিতে সহায়তা করিবে। 'সে আসে ধীরে' 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না' প্রভৃতি কয়েকটি সঙ্গীতে একটা কুঞ্জবন কল্পিত হইয়াছে বলিয়াই কি এগুলিকে অভিসারের গান বলিতে হইবে ?

কবিকল্পনা কি নিতান্ত সাধারণ শহনাগারকে idealise বা আদর্শীভূত করিয়া সৌন্দর্য্যময় কুঞ্জবন বা প্রমোদোচ্চানে রূপান্তরিত করিতে পারে না? ইহাতেই ত কাব্যের সার্থকতা। 'সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে'—ইহা কি কুলটা অভিসারিকার চিত্র? না, 'কম্প বক্ষে, নম্র অঁখিপাতে' স্বামিসকাশে গমনশীলা, নববিবাহিতা বঙ্গবধুর যথাযথ অথচ অতিসুন্দর আলেখ্য?

'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না, বেলা হ'ল মরি লাজে!' এই সলজ্জ-করুণ অনুযোগ কতদিন কত বিলম্বে নিদ্রোখিতা নববধুর মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। শয়নকক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া পরিজনবর্গের সম্মুখীন হওয়া তাহার পক্ষে এতই লজ্জাকর যে তাহার মনে হয় সে যেন 'চলিবে পথেরি মাঝে'।

লজ্জাবিমূঢ়ার এই একান্ত সঙ্কোচ যে গানে আপনার ভাষা লাভ করিয়া সার্থক হইয়াছে তাহা কি দুর্নীতিমূলক?

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে দ্বিজেন্দ্রলাল এই সব গান ঘোরতর দুর্নীতি

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

মূলক মনে করিয়া রবীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠে কশাঘাতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এই উদ্দেশ্যসাধন কল্পে তিনি ঐ সকল গান প্যারডি করিয়া 'আনন্দবিদায়' রচনা করিলেন। এই ব্যঙ্গনাট্যখানির প্রকাশ ও অভিনয় তাঁহার অমল যশোরাশির মধ্যে কলঙ্ক আনিয়া দিয়াছে, এ কথা আমাদের কাছে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে।

দেবকুমার বাবু বলেন যে ষ্টার থিয়েটারে উক্ত নাটকের অভিনয়ের পর তিনি আপন দোষ বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা জানি তাহা ঠিক নয়। তিনি যে ইহা অগ্নায় বলিয়া স্বীকার করেন নাই, এবং এজন্য অনুতপ্তও হন নাই তাহার প্রমাণ আছে। যখন তিনি 'আনন্দ-বিদায়ে'র জন্ম চারিদিকে নানারূপে লাঞ্চিত হইতেছিলেন, তখন তিনি উহা যে কর্তব্যানুরোধেই লিখিয়াছিলেন, তাহাই সকলকে বুঝাইবার জন্ম 'দৈনিক বেঙ্গলা' পত্রিকায় একখানি ইংরাজি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রের শেষাংশটি এইরূপ—

My object was to expose the inherent immorality of these songs, and if I succeeded in creating disgust in the minds of the audience my object was gained.

(এই সকল গানের অস্বনিহিত দুর্নীতি বাহির করিয়া দেখানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল, এবং যদি আমি রঙ্গালয়ের দর্শকগণের মনে বিরক্তি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকি তাহা হইলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে)।

কোন কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্রেও তিনি এই মর্মে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার দৃঢ়-চরিত্রের অনুরূপ। নিন্দনীয়

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

মনে করিলে তিনি এরূপ কাজ কখনও করিতেন না। 'আনন্দ-বিদায়ের' ভূমিকাতেও তিনি এই কথা বলিয়াছেন। আর তিনি যদি সত্যই অমৃতপ্ত হইতেন, তাহা হইলে 'আনন্দ-বিদায়ে'র প্রচার বন্ধ করিয়া দিতেন। কিন্তু তাহাও তিনি করেন নাই। আর দেবকুমার বাবুর একথাও বোধহয় সত্য নহে যে, রবীভক্তগণ "অশ্রান্ত বেগে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অগ্রায় আক্রমণ করিলে" তিনি অবশেষে উত্ত্যক্ত হইয়া 'আনন্দ বিদায়' লিখিয়াছিলেন। কারণ, বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে আনন্দবিদায়ের অধিকাংশ গান উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইবার বহু পূর্বে ১৩১৩ কিংবা ১৩১৪ সালের 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলাল যে রীতিমত ভাবিয়া চিন্তিয়া এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধ আজ বেশী কিছু লেখা নিম্প্রয়োজন।

যাহারা দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন ও কাব্যের সহিত কিঞ্চিন্মাত্রও পরিচিত, তাঁহারা জানেন যে একদিকে তিনি যেমন চরিত্রের দৃঢ়তায়, মনের স্বাধীনতায়, হৃদয়ের উচ্চতায়, ষথার্থ পৌরুষ-সম্বিত নির্ভীক, তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, অপরদিকে তেমনই তাঁহার অগাধ স্বদেশপ্রেম এই সকল মহৎগুণের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যকে মহনীয় ও উন্নতির সোপান-স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে। তিনি বায়রণের ভক্ত ছিলেন, এবং এই ইংরাজ কবির উদ্দেশে তিনি যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহার কয়েক পংক্তিতে (ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া) তাঁহার স্মৃতির বন্দনা করিয়া আজ এই আলোচনার উপসংহার করি :—

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

তোমার 'হৃদয়'-রাজ্য, সমুদ্রের মত ।—তুমি
কভু উপহাস
করিয়াছ, কভু ব্যঙ্গ, কভু ষ্ণা, ফেলিয়াছ
বিষাদ-নিখাস,

গভীর গর্জন কভু,
কভু তিরস্কার ;
আগ্নেয় গিরির মত দ্রবীভূত জ্বালা কভু
করেছ উদ্‌গার,
কভু প্রকৃতির উপাসনা যোড়করে, ক্ষুদ্র
বালকের প্রায়,
'আপন' দেশের জন্ত জ্বলিয়াছ 'সদা' তীব্র
মর্শবেদনায় ।

দেবেন্দ্রনাথ সেন

রবীন্দ্রনাথের যুগে তাঁহার সাময়িক যে কয়জন প্রতিভাশালী কবি ও সাহিত্যিক তাঁহার প্রভাব এড়াইয়া বঙ্গসাহিত্যে অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহাদেরই অকৃতম। দ্বিজেন্দ্রলাল, অক্ষয়কুমার, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অন্নভলাল রবীন্দ্রনাথের আওতায় পড়িয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্য হারান নাই। ফলে আমাদের কাব্য ও নাট্যসাহিত্য ইহাদের অমূল্য দানে অপূর্ব শোভায়, সম্পদে ও বৈচিত্র্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ ইহাদের আসরে গান গাহিয়াছেন। সে গানের সুর,—ভাব ও চিন্তার খুব উঁচু পর্দায় না পৌঁছিলেও তাহা যেমন মিষ্ট, তেমনই পবিত্র।

দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বয়সে দুই কি তিন বৎসরের বড় ছিলেন। উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রীতি ও সৌহার্দ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সোনার তরী' দেবেন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেন। দেবেন্দ্রনাথও তাঁহার 'গোলাপগুচ্ছ' রবীন্দ্রনাথকে ও তাঁহার 'অশোকগুচ্ছ' শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে উৎসর্গ করেন। এই 'অশোকগুচ্ছ' লইয়াই আমরা তাঁহার কাব্যসমালোচনা আরম্ভ করিব।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

কবির যৌবনে রচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। সর্বসম্মতিক্রমে ইহাই তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ, দেবেন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই পুস্তকখানিই তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। কবি গিরীন্দ্রমোহিনী যখন এই বইখানির নাম 'অশোকগুচ্ছ' রাখিলেন, তখন কবি একটি মনোমত্ত নাম পাইয়া পুলকিত হইলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ভয়ও হইল বুঝি বা এ নাম সার্থক হইবে না। এই ভাবটি অশোকগুচ্ছের প্রথম কবিতাতেই ব্যক্ত হইয়াছে।

অশোকের গুচ্ছ? কই মা, ইহাতে কোথা

নব বসন্তের কচি চিকণ পল্লব?

রাতের নীমন্ত-শোভী সিন্দূরের মত

আকাশপুরের কই পদ্মরাগছটা।

নবোটার ব্রীড়া-দীপ্ত আরক্ত কপোলে

হাসি স্নেহ, কোথায় মা, আনন্দেব রাশি?

পবিত্র বিবাদ কই? যে মাধুরী হেরি.

মুছিয়া চোখের জল মলিন অকলে.

হাসিত মধুর হাসি চিরছুঃখী সীতা।

কিন্তু কবির এইরূপ ভাবনার কোন কারণ ছিল না। একটা বাসন্তী হাওয়ার মধুর হিল্লোল এই গ্রন্থের সর্বত্রই পাঠকের প্রাণ স্পর্শ করিয়া তাহাকে আনন্দ-বিহ্বল করিয়া তোলে। আর বাঙ্গালীর দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য ও বিবাদ, আনন্দরূপিনী নবোটার ব্রীড়াদীপ্তি আর বিবাদময়ী বাগবিধবার অন্তর-ব্যথা কবি দেবেন্দ্রনাথের নিপুণ তুলিকা-সম্পাতে বেরূপ নানাবর্ণে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে সেরূপটি বুঝি আর কাহারও কাব্যে বড় বেশী দেখিতে পাই না। এই নানাবর্ণের মধ্যে যে রঙটি

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

প্রাথমিক লাভ করিয়াছে সেটি হইতেছে অশোকের রক্তমা। সে রক্তমা কখনও স্বামিসোহাগিনী তরুণীর সীমন্তশোভা সিন্দূরের মত তাহার পবিত্র দাম্পত্যলীলার উচ্ছ্বসিত আনন্দরাশি আমাদের চক্ষের সম্মুখে আনিয়া দেয়, কখনও বা তাহা নবপরিণীতা কিশোরীর কপোলে গণ্ডে বাসরের প্রথমচুম্বন যে লজ্জাকরণরেখা আঁকিয়া দেয় তাহারই আভা, মনে হয় যেন তাহা বাসুর্ঘ্যের সমস্ত শোভা লইয়া দাম্পত্যের জীবন-প্রভাত রাঞ্জিয়া দিতেছে। আবার এই রক্তমা দেখি কবি-প্রিয়র 'অলঙ্কৃত হুঁচরণে,' যাহার অনবদ্য সৌন্দর্যের উপর অলঙ্করণের অত্যাচার দেখিয়া কবি এইরূপে অনুযোগ করিতেছেন :

উদার উদার কাল,
সাক্ষা মেঘ দত্তল'ল
রঞ্জিল গগনাস্তন। বল, বল জালি,
বসন্তে সাজালে কেন শব্দ'র ডালি :

কবি তাই চুপি চুপি খোকায় হাতে জলের ষটি দিবা তাহাকে জননীর পায়ের উপর ঢালিয়া দিতে শিখাইয়া দিয়াছেন। এই কারণে কিংবা যখন ঘোন্টা খোলার অত্যাচারে

সুত্র রোষ জেগে উঠে
রাঙা তেঁত ওপুট
জারো রাঙাইয়া দিল, কবি বঙ্গ-কেলি,
কে যেন সিন্দূর দিল লাল পুষ্পে ঢালি।

কখনও অভিমানিনী নারীর রোষাকরণ বদনমণ্ডল কি অশোকগুচ্ছের লোহিত রাগ ধারণ করে না? দাম্পত্যজীবনের বিবিধ বর্ষবৈচিত্র্যের মধ্যে এই যে লালের খেলা ইহার মধ্যে বেদনার রক্তরাগ আসিয়া যিগিয়াছে।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

কবিধবার বর্ষসুন্দর হৃদয়-কৃত হইতে নিরন্তর যে রক্ত নিঃসৃত হইতেছে
অহাও কবি অনাবৃত করিয়া দেখাইতে ভুলেন নাই। তাঁহার
অশোক-গুচ্ছের লাল রঙ বুঝি বা তাহাতে আরও বেশী গাঢ়তর হইয়াছে।

কিন্তু কবির মন ইহাতেও তৃপ্তিলাভ করে কই? অশোক নিজে এত
মাল কেন সে সমস্তার ত সমাধান হইল না! 'চেতনাচেতনে প্রকৃতিকূপন'
কবি প্রকৃতির ছলনা অশোক-তরুকে ভিজাসা করিতেছেন :

হে অশোক, কোন্ রাস্তা চরণ চুষনে
মর্মে মর্মে শিহরিয়া হ'লি লালে মাল?
কোন্ দোলপূর্ণিমায় নব বৃন্দাবনে
সহর্ষে মাখিলি ফাগ প্রকৃতি-ছলনা?
কোন্ চিরসধবার ব্রত উদ্‌ঘাপনে
পাইলি বাসন্তী শাড়ী সিন্দূরবরণ?
কোন্ বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে
এক রাশি ব্রীড়া হাসি করিলি চয়ন।
বৃথা চেঁচা—হায়। এই অবনী মাঝারে
কেহ নহে জাতিশ্বর—তরু জীব প্রাণী।
পরানে লাগিয়া ধাঁধা আলোক অঁধারে
তরুও গিয়াছে ভুলে অশোক-কাঁহনী।
শৈশবের আবছারে শিশুর দেয়লা;—
ভেমতি অশোক তোর লালে লাল খেলা।

কিন্তু কবি-চিত্ত ইহাতেও সন্তোষলাভ করিল না। অশোকের ত
প্রকৃত পরিচয় তিনি পাইলেন না। আবার তিনি আরএকটি সনেটের মধ্যে

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

উপমা-ভরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন সাজাইয়া অশোকের জন্ম-ইতিহাস আবিষ্কার
করিয়া ফেলিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন ।

কোথায় সিন্দূর গাঢ়—সধবার ধন ?
আবির, কুকুম কোথা, গোপিনী-বাহিত ?
কোথায় মুরারি কণ্ঠ আরক্ত বরণ ?
কোথায় সন্ধ্যার মেঘ লোহিতে রঞ্জিত ?
কোথায় বা ভাস্ক্রে রাজা রক্তের লোচন ?
কোথা গিরিরাজ পদ অলঙ্ক-মণ্ডিত ?
মদন বধুর কোথা অধরের-কোণ,
ব্রীড়ার বিক্ষেপে মরি সতত লোহিত ?
সকলেরি কিছু কিছু চাকতা আহরি',
ধরি রাগ অপরাধ গাঢ় ও তরল,
গুচ্ছে গুচ্ছে তরুরে করিয়ে উজ্জল
রাঞ্জিছে অশোক ফুল, মরি কি মাধুরী ।

উপরে যে করটি ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতেই দেবেন্দ্রনাথের
ভাষা ও ছন্দের লালিত্য এবং চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার কিছু পরিচয় পাওয়া
হাইবে । তাঁহার ভাব, ভাষা ও ছন্দ সর্বত্র সুমধুর ও স্বচ্ছন্দগতি ;
একটিমাত্র ভাবের বাঞ্ছনায় চিত্রের পর চিত্র, উপমার উপর উপমা দিতে
ভিনি বোধ হয় অধিতীর্ণ । ভাষার মধ্যে কোথাও ধোঁয়াটে বা আবছায়া
ভাব নাই, এবং এই ভাষার মাধুর্য্য ও ছন্দের সলীল প্রবাহ সর্বত্র
অপ্রতিহত । কবি যেন সৌন্দর্য্যের পসরা খুলিয়া বসেন । সেখায়
'কোহিনুরে কোহিনুরে আলো যে উথলি পড়ে, ছড়াছড়ি ইন্দ্রনীলে হীরায়

কীৰ্ত্তনবিৰ ভাৰণা

‘সুভাষা’ আৰু দুএকটি উল্লেখ্য দিবাৰ লোভ সংবৰণ কৰিতে পাবিলাখ
না। একটী সনেটে কবি ‘সুভাষা হাৰি’ এইৰূপে বৰ্ণনা কৰি তেহেঁন :—

হে ৰূপসী, বিশি শেষে কোন্ নদীধাৰে,
কোন্ স্বপ্নময় পুৰে, কোন্ কামাখ্যাৰ,
চৰণে নুপুৰ ঘেৰ, অনন্ত মাৰাৰে,
বাহিৰা সে কুনুধনি আইলে হেথায় ?
নাগেশ্বৰ চাপাতলে কোন্ অলকাৰ
দাঁড়াইবা ছিলে তুমি, মদনমোহিনী ?
এক ৰাশি জাতি যুথী, বগ্নিকা কামিনী
কাঁপাইবা কোলে তব পশিল হিয়ায়।
গান নাহি বোকা বায়, ভাসে শুধু হুয় ;
কুল নাহি দেখা বায়, সোঁৱত কেবলি ;
প্ৰাণেৰ গবাক দিবা জ্যোৎস্না স্নমধুৰ
উছলিয়া অধৰেতে পড়ে আসি চলি।
সে কাহিনী তুমি আমি গোছি এবে ভুলি।
এ কি জাসি। এ বে শুধু আকুলি ব্যাকুলি।

আৰাৰ উচ্চ হাৰি কবিৰ প্ৰাণে কিৰূপ ভাবেৰ লহৰী তুলিয়াছে
ভাৰাও একটু পৰিচয় দেওয়া দৰকাৰ :

মূৰ্ত্তিমতী ৰাগিনীৰ ভূজমেখলাৰ
বাজি ঘেৰ উঠিয়াছে কৰুণ কিৰ্ণী,
হৃদয়েৰ কুণ্ডে কুণ্ডে বাসন্তী উবাৰ
জালি ঘেৰ উঠিয়াছে নুপুৰ শিঞ্জিনী।

কবিতাগুলির ভাবধারা

‘ডায়মণ্ড-কাটা মল’, ‘আলতা মোছা’, ‘ঘোমটা খোলা’ খোঁপা খোলা’ প্রভৃতি অনেক কবিতায় কবি তাঁহার এই চিত্রাঙ্কনী শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। মলের রেওয়াজ অনেক দিন হইল উঠিয়া গিয়াছে ; আলতাও অদৃশ্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিংবা হস্ত পাছকা-শোভিত চরণকমলে এখন আর তাহার স্থান নাই ; ঘোমটা বা খোঁপা খুলিয়া এখন আর নববধূর লাজ ভাঙ্গাইতে হয় না, ঘোমটা এখন সীমন্তের শেষ প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোনরূপে টিকিয়া আছে, তাহাও বুঝি আর বেশী দিন থাকে না। আর বাঙ্গালীর মেয়ের বড় আদরের খোঁপাও এখন অনাদৃত, বুঝি তাহারও দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সেদিক আক্ষেপ করাও বৃথা। কালের প্রভাবে অনেক বস্তুই ভাসিয়া যায়। সে সব বস্তু যদি কাব্যের উপাদান রূপে কোন কবি গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলেও আমাদের কাব্যরস উপভোগের পক্ষে কোনই হানি হয় না, যদি সেই কবির রসসৃষ্টি খুব উচ্চশ্রেণীর হয়। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের চেহারাটা যদিও কালক্রমে বদলাইয়া যায় তাহা হইলেও দেবেন্দ্রনাথের কাব্যসৌন্দর্য্য গ্লান হইবে না। আমাদের সাহিত্যভাণ্ডারে তাঁহার কবিতাগুলি চির সম্পৎ-স্বরূপ বিরাজ করিবে।

করুণ রস ফুটাইতেও দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন সিক্কহস্ত। বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বিধবা নারীরূপে যে বিষাদ-প্রতিমা ও মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা আমাদের জীবনকে বেদনাতুর করিয়া রাখিয়াছে কবি তাহাদের কথা বিস্মৃত হন নাই। পূর্বে ইহার একবার উল্লেখও করিয়াছি। এখানে যেমন এক-দিকে দাম্পত্যজীবনের উচ্ছল হাসিরাশি আছে, অপর দিকে তেমনিই আবার যুবতী বিধবার তপ্ত অশ্রুও তাহারই অন্তরালে নিরন্তর ঝরিতেছে।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

ইহার অন্য কবির প্রাণ কাঁদিয়াছে এবং তিনি তাঁহার মোহিনী তুলিকার স্পর্শে কয়েকটি কবিতায় বঙ্গবিধবার যে অমুপম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা যেমন করুণ তেমনই সুন্দর। সামিবিয়োগবিধুরা নারী যখন বিলাপ করিতেছে—

সকলি শু হইল স্বপন ।
তোমার সহিত নাথ, উহ জনমের নাথ
চিতায় করিল আরোহণ ।
অভাগীর রূপ নাও সিন্ধুরের কোটা নাও
নাও নাও বসন ভূষণ ;
অঙ্ককান একরাশ নিবিড় এ কেশপাশ
করিত যা চরণ চুম্বন ।

তখন এই কাতরোক্তি শুনিয়া আমাদের নয়ন বাষ্পাকুল হইয়া উঠে । কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মধ্যে যে অসীম প্রেম, ধৈর্য্য ও আত্মসমর্পণের ভাব দেখি তাহা কি হৃদয়স্পর্শী !—

দাও দাও স্মৃতিটি তোমার,
ওই স্মৃতি বুকে করে সারাদিন সারাক্ষণ
করিব ও স্মৃতি স্মরণ ।
হে নাথ ! কিছু না চাই, এই ভিক্ষা তব ঠাই
দাও দাও অন্নভোগী তোমার জীবন ।

এই দেবীতুল্যা বিধবার উপর হিন্দু সমাজের নিষ্ঠুরতা তিনি 'রাধারানী' শীর্ষক কবিতায় দেখাইয়াছেন ।

কিন্তু কবির এই করুণাধারা শুধু যে বিধবারই উপর বর্ষিত হইয়া নিঃশেষ হইয়াছে তাহা নয় । হিন্দু সমাজ নারীজাতির উপর যে অভ্যুচারণ

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

করিয়া আসিয়াছে বা এখনও করিতেছে তাহা হৃদয়বানু কবির হৃদয় বিগলিত না করিয়া থাকিতে পারে না। কোলীচ ও পণপ্রথার যুগ-কাঠে হিন্দু সমাজে যে নারী বলি হইয়া থাকে দেবেন্দ্রনাথ তাহার যথার্থ চিত্র দিয়াছেন। কুলীন-যুবতী সুদীর্ঘকাল স্বামিদর্শনাকাঙ্ক্ষায় অতিবাহিত করিয়া শেষে যখন একদিন তাহার সেই চির-অভীপ্সিত বস্তুটিকে পাইল তখন তাহার তঙ্করবৎ নৃশংস ব্যবহারে কিরূপে সে

সুগার ও রোয়ে

ভালের মিন্দুর বিন্দু কেলিল মুছিয়া।

এবং পরে সে কিরূপে ধীরে ধীরে বিপথে পদার্পণ করিল তাহা 'কলঙ্কিনীর আত্মকাহিনী'তে উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। কোলীচের যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। এরূপ চিত্র বোধ হয় আর কোন কবিকে অঙ্কিত করিতে হইবে না। কিন্তু পণপ্রথার শাণিত ঝড় এখনও বঙ্গবালার মস্তকোপরি উদ্ভত রহিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ কখনও শ্লেষবর্ষণ দ্বারা, কখনও বা করুণ রসের উৎস ছুটাইয়া এই প্রথার জঘন্যতা প্রকটিত করিয়াছেন। কবি বিংশ শতাব্দীর বরকে দশহাজার টাকার ভি পি পার্শেলে বিবাহসভায় পাঠাইয়াছেন। আবার অন্তত দেখি কন্যার পিতা প্রতিশ্রুত দশ সহস্র মুদ্রা দিতে না পারায় 'বাকি পাঁচশত রূপেয়া'র জন্ত খণ্ডবগ্ৰহে বন্দিনী কন্যা মনের দুঃখে তিলে তিলে পুড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল!

অকাল হেমন্ত আসি লয়ে পাণ্ডু হিম রাশি

তুঝারে তুঝারে দিল সে কনক-নলিনী।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

নারীর প্রতি এই ঘোর অনাদরে হিন্দু সমাজ উৎসন্ন বাইভে
বসিয়াছে। কবি তাই তাঁহার 'দুহিতামঙ্গলশঙ্খ' বাজাইয়া বলিতেছেন—

নাহি যুগা, নাহি গজ্জা! ধিক! ধিক! অধম বাঙ্গালী
তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধি ভস্মে যুত! কি অন্ধ নয়ন।
পুত্র হ'লে শাখ বান্ধে, কন্তা হ'লে আঁধার ভবন।
নারীরে অবজ্ঞা করি মাখিয়াছ মুখে চুণকালি।

* * * *

মাতা নারী, ধাত্রী নারী, ভয়হরা দেবতারূপিণী,
নারীই শৃঙ্খলা বিধে, মিষ্টরস, সৌন্দর্য্য আধার।
নারীর মাহাত্ম্য মূঢ়, বুদ্ধিলে না, তাই হাহাকার
আজি বন্ধে গৃহে গৃহে।

তিনি যে হাশুরসের অবতারণা করিতেও বিলক্ষণ পটু ছিলেন
তাঁহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাঁহার 'দগ্ধকচু' নামে সরস গদ্য গ্রন্থখানি।
স্বপ্নরামের শ্রালিকারা মিলিয়া কবিকে দগ্ধ কচু খাওয়াইয়া কিরূপে
লাঞ্ছিত করিয়াছিল এবং অতঃপর তিনি নিজে তাঁহার কিরূপ প্রতিশোধ
লইয়াছিলেন, তাহাই এই গ্রন্থের বর্ণনীর বিষয়। ইহার ছত্রে ছত্রে
হাসির ফোয়ারা ছুটিয়াছে। তাঁহার কবিতার মধ্যেও হাশুরসের অভাব
নাই। 'কোন বিশ্বনিন্দুক সমালোচকের প্রতি' শীর্ষক ব্যঙ্গ কবিতা হইতে
কয়েক ছত্র এখানে তুলিয়া দিতেছি :

পূর্বজন্মে ছিলে তুমি শোধিত-শোধক
কোরিয়ার জেঁক বুঝি, হে সমালোচক?

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

পায়স পান্‌সে বড়, অমৃত ও টক্ ।—
মানুষের রক্তবিন্দু মরি কি রোচক ।
অঁকা বাঁকা গতি তব কথাগুলি বক্র ;
এক রত্তি বিয় নাই, কুলোপানা চক্র ।
রসনা-ধনুকে তীক্ষ্ণ বচনের তীর ;
ঢাল নাহি, খাঁড়া নাহি, তবু মহাবীর ।
তু ব'ড়ি ছুঁড়িয়া ভাবো বাগিয়াছ ভোপ ;
বজ্রধর । খাম খাম ;—বোকা গেছে কোপ ।
পরচুনে হে মুলর, চাকিয়াছ টাক ;
বুটো চুনি, বুটো পান্না—তারি এত জাঁক ?

এ পর্য্যন্ত আমরা 'অশোকগুচ্ছ' নইয়াই প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছি । এইবার দেবেন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি সম্বন্ধে কিছু না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় । ১৩১২ সালে শারদীয়া পূজার পূর্বে তিনি একসঙ্গে 'গোলাপগুচ্ছ', 'শেফালিগুচ্ছ', 'পারিজাতগুচ্ছ', 'অপূর্ব নৈবেদ্য', 'অপূর্ব শিশুমঙ্গল' ও 'অপূর্ব বীরাজনা' এই ছয়খানি নূতন কবিতা-পুস্তক ও অশোকগুচ্ছের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ।

তাঁহার স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণপাঠশালা হইতে এই সময়ে যথেষ্ট অর্থাগম হইতে থাকে । সেই অর্থে তাঁহার এই সমগ্র গ্রন্থপ্রকাশ সহজেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল । বিভিন্ন মাসিকপত্রে বহুকাল ধরিয়া যে সকল অসংখ্য কবিতা ছড়াইয়া রহিয়াছিল, সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া তিনি এই কয়খানি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন ।

এই কবিতাগুলির সর্বত্র দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভার দীপ্তি আনন্দাঙ্গন ; কিন্তু তথাপি আমাদের মনে হয়, 'অশোকগুচ্ছের

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির গায় সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা এই গ্রন্থগুলির মধ্যে বড় বেশী নাই। সেই দাম্পত্য লীলার চিত্র, সেই কুপ্রথাপীড়িতা হিন্দুনাবীর হুঃখকাহিনী, সেই নিছক সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অশ্রান্ত প্রয়াস—এ সমস্তই আছে ; কিন্তু তথাপি যেন পাঠকের মন তৃপ্তিব রসে ভরিয়া উঠে না।

কোন কোমল কবিতা ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গীতে মধুসূদন ও হেমচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়। দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন যে, এই দুই জনকেই তিনি তাঁহার কাব্যগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া গইয়াছিলেন। তাঁহার ‘অপূর্ব বীরাজনা কাব্য’র প্রারম্ভে তিনি মাইকেলের উদ্দেশে বলিতেছেন—

হে গুরু, কখনও তোমা দেখিনি নয়নে,
কিন্তু দেব। দ্রোণ-শিষ্য একলব্য সম
মানসে গড়িয়া তব মূর্তি নিরুপম
শিখিয়াছি ধনুর্বিজ্ঞা তোনারি সদনে।

কিন্তু এই গুরু-শিষ্য সম্পর্ক মানিয়া লওয়া কঠিন। কারণ, হেমচন্দ্রের পৌকর্য ও রোদ্দরস কিংবা মাইকেলের জলদনির্ঘোষ দেবেন্দ্রনাথে কুত্রাপি নাই। তাঁহার বৃহত্তর রচনাগুলি প্রায়ই ব্যর্থ হইয়াছে। পক্ষান্তরে দেবেন্দ্রনাথের যাহা বৈশিষ্ট্য—তাঁহার মাধুর্য্য, লালিত্য ও চিত্রপ্রাচুর্য্য—হেমচন্দ্রের ‘কবিতাবলী’র মধ্যে খুব বেশী পাওয়া যায় বলিয়া মনে করি না। অবশ্য মাইকেলের ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্য’ বাঙ্গালার গীতিকাব্য-সাহিত্যে অতুলনীয়। সুতরাং আধুনিক যুগের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বা কবি কালিদাস রায় বিশেষরূপে রবি-ভক্ত হইলেও যেমন রবীন্দ্রনাথের অনুকারী বা তাঁহার কাব্য-শিষ্য নহেন, তেমনই দেবেন্দ্রনাথও নিজেকে মধুসূদনের

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

সাক্ষরেন্দ বসিয়া প্রচার করিলেও তাঁহার কাব্যে তাঁহার বিশেষ প্রমাণ নাই। একস্থলে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, 'আমার এ রবিতপ্ত কল্পনাকুমুদী ফুটিবে কি পুনর্বার?' তাঁহার এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন বসিয়া ত আমরা মনে করি না।

সে যাহা হউক, আমরা এখন তাঁহার শেষ কল্পনানি পুস্তকের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দিয়া প্রবন্ধ শেষ করি। 'অশোক-শুচ্ছে' পরই 'গোলাপ-শুচ্ছে'র স্থান। ইহার প্রথম কবিতা—

এবে গোলাপে গোলাপে ছাইয়ে ফেলেছে

এ নধু কানন দেশ—

অনবস্ত। কবি যে ইহার পরেই অন্য একটি কবিতায় বলিতেছেন—

চিরদিন চিরদিন রূপের পুঞ্জারী আমি

রূপের পুঞ্জারী—

তাঁহার যথেষ্ট প্রমাণ কবি এই গ্রন্থেও দিয়াছেন। তাঁহার 'প্রাণ-বাতায়নে ভাবগুলি সব গোলাপি নেশার চূর।' নারীর দেহে, দম্পতীর প্রেমলীলায় ও শিশুর হৃদয়-রাজ্যে একই সৌন্দর্যের বিভিন্ন বিকাশ দেখিয়া কবি আত্মহারা। তাই কখনও তিনি 'মধুর জ্যোৎস্না'-রূপিণী শ্যামাকী সুন্দরীকে 'আধ আলো আধ ছায়া বনরাজি গাঢ়' বসিয়া বর্ণনা করিতেছেন। আবার কখনও বা বালার্ককিরণসন্নিভা গৌরাকীর

গীতাঞ্জলির ভাষ্য।

'রূপরোজে ছ'নয়নে ধাঁধা' লেগে যায়।' যখন 'আগ্রহে দম্পতা
করে প্রথম চুম্বন' তখন সেই মুগ্ধ বিহ্বল নব-দম্পতীর গায় কবির
কদরেও—

কুহরিয়া উঠে পিক, শিহরিয়া উঠে দিক
ভরে বায় ফলে ফলে জ্বলন্ত বাবল

আর তিনি ভাবিয়া আকুল—

কি জানি কি নিধি দিয়া গড়িল চতুর বিধ
প্রথম চুম্বন।

আবার সন্তঃপদ্মাবিযোগব্যথিতের 'শেষ চুম্বন' কামনা—

নাও দাও বিদায়-চুম্বন।
জীবনের রত্নাগারে একবারে করি গালি
অভাগারে কঁকি দিবে মরণে দিতেছ ডালি।
ল'য়ে ও হারার কুঁচ চক্কের সলিল মুক্তি
দাঁড় করিবে নখি, জীবন যাপন।

'অশোক-গুচ্ছের' বিধবার বিলাপস্মৃতি আনিয়া দেয়। এই কারুণ্যধারা
'বিরাগীর আক্ষেপ,' 'উন্মাদিনীর কাহিনী' প্রভৃতি কবিতারও ছন্দে ছন্দে
প্রবাহিত হইয়াছে। 'বাকি পাঁচশ রূপেরা'র উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি।
এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'কদম্বসুন্দরী' নামক সুদীর্ঘ কবিতাটি নির্দোষ
না হইলেও নানা রসের সমাবেশে বেশ উপভোগ্য।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

‘অপূর্ব নৈবেদ্য’ ও ‘অপূর্ব শিশুমঙ্গল’ ব্যক্তিগত কবিতার সমষ্টি, প্রথম খানি কবির বন্ধু-বান্ধব এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, কবি করুণানিধান, কবি সত্যেন্দ্র নাথ, কবি কালিদাস রায় ইত্যাদি তাঁহার পরিচিত কবি ও সাহিত্যিকদের স্তুতিবাদে পূর্ণ, এবং অপর খানিতে কবি শিশুদের সম্বন্ধে লিখিত নানা কবিতার মালা গ্রথিত করিয়াছেন।

এই গ্রন্থগুলি ‘অপূর্ব’ কেন, তাহার উত্তরে কবি স্বলিখিত ভূমিকায় বলিয়াছেন, ‘এই কাব্যগুলির অধিকাংশ কবিতাই শ্রীভগবানের উদ্দেশে বিরচিত হইয়াছে।’

এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ একদিন আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যিক মনে করি। তিনি বলিয়াছিলেন,—

‘আমি যে সকল মহিলা কি বালিকার স্তুতিবাদ করিয়াছি, তাঁহারা ই আমার কবিতার মুখ্য বিষয় নহেন। আমি তাঁহাদের অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন দিক হইতে একটা ideal womanhood—নারীত্বের পূর্ণ আদর্শ অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেইজন্য এই সকল কবিতাতেও প্রায়ই আধ্যাত্মিকতা আসিয়া পড়িয়াছে; কারণ, নারীজাতিকে আমি জগন্মাতার অংশরূপিণী, ভাগবতী শক্তির অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছু মনে করিতে পারি না। আমার শিশুসম্বন্ধীয় কবিতাগুলিও এই অর্থে ব্যক্তিগত হইয়াও সার্বজনীন। এখানেও আমি শিশু-চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া বিভিন্নভাবে সেই অনন্ত সৌন্দর্যের আভাস দিতে প্রয়াস পাইয়াছি। একটা আদর্শ শিশুজীবন যাহার প্রকাশ ভিন্ন হইলেও মূলতঃ এক, ইহাই আমার শিশু-কবিতাগুলির বিষয়।’

সুতরাং এই ‘অপূর্ব’ কবিতাগুলি কোন্ অর্থে ‘শ্রীভগবানের উদ্দেশে

গীতাজলির ভাবধারা

শ্রোতৃস্বা কিরণ-মাথে তুইও তাদের সাথে
খেলাতে মগন ছিলি গান গেয়ে গেয়ে ?
অঙ্গরার কণ্ঠে যথা আরক্ত অপরাঙ্কিতা
পারিজাত লতাগুলি উঠে বেয়ে বেয়ে,
তুইও ইন্দ্রাণী গলে হেলে ছলে কুতূহলে
ছিলি লগ্ন, মগ্ন দেবী তোর স্পর্শ পেয়ে ।
এত দিন কোথা ছিলি পাগলিনী মেয়ে ?

ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের 'খোকার জন্ম' তুলনা করা যাইতে পারে ।
দেবেন্দ্রনাথের কবিতা নিছক সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ, আর রবীন্দ্রনাথের
কবিতায় সৌন্দর্য্যের সহিত সত্যের অপূর্ব সমন্বয় ।

আর একটি ছোট মেয়েকে দেখিয়া কবির দশভূজা প্রতিমা মনে
পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহা শুধু তাহার রূপের জগ্ন ।

দেখ রে দেখ চেয়ে মোহিনী রাঙা মেঘে,
ভুবন-আলো-কন্যা মোহন রূপ ।
আয় রে করি পূজা এসেছে দশভূজা—
বাজাবে শাঁখ তোরা আলা রে ধূপ ।
যেন বে মুখ দিয়া অমিয়া উথলিয়া—
পড়িছে মার নোব । এ কি রে রূপ !
জোছনা পড়ে খসি, হের রে মুখশী ।
আলোকে ভরি গেল মানস-কূপ ।
কোথা সে সারি সারি গোকুলে গোপনারী'
কাঁকণ ভুজে বাজে, চবণে মল,—
গলেতে বনমালা, (যেন রে বনমালা)
চুলেতে থাকে থাকে বকুল দল,—
তাদেরও আরি জুরি তাদেরও ভারিভুরি
মোর মায়ের কাছে কেবলি ছল ।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

প্রকৃত আধ্যাত্মিক ভাবের সঙ্গে এই সব কবিতার বিশেষ সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। 'শিশুমঙ্গলে' এইরূপ সুন্দর কবিতার অভাব নাই।

বাক্সালার গীতি-কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের স্থান যে খুব উচ্চে তাহাই আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বাক্সালীর ভাবপ্রবণ ও সৌন্দর্য্য-পিপাসু প্রাণ চিরকাল গীতি-কবিতার কোমলকান্ত সঙ্গীতে আপনাকে শতধারে উচ্ছ্বসিত করিয়া আমাদের জাতীয় সাহিত্যকে এক অসামান্য বিশেষত্ব দান করিয়াছে।

সেই সঙ্গীতের সুর কখনও বা নরনারীর প্রেমলীলার শাস্বত রহস্য ও অনন্ত মাধুর্য্য ব্যক্ত করিয়াছে, কখনও বাক্সালীর নিজস্ব দাম্পত্য জীবনের অন্তর্নিহিত সুখ-দুঃখের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে আরও বেশী সুন্দর, আরও বেশী উজ্জ্বল ও বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়াছে। এই শেবোক্ত সুরই দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে ধ্বনিত হইতেছে। তাহাতে রবীন্দ্রনাথের মনস্থিত বা হেমচন্দ্রের তেজস্বিতা না থাকিতে পারে, তাহাতে হয়ত দেশহিতৈষণার উন্মাদনা নাই বা বিশ্বরহস্যের নিগূঢ় সঙ্গীতও শুনিতে পাই না; কিন্তু তাহা হইলেও এই সুর বাক্সালীমাত্রেরই প্রাণস্পর্শ করে। কারণ, তাহার প্রাণের তারে নিরন্তর যাহা বঙ্কিত হইতেছে, তাহারই এক সঙ্গীতময় প্রতিধ্বনি সে তাহাতে শুনিতে পায়, তাহারই গাত্রস্থ জীবনের সৌন্দর্য্যময় চিত্র তাহার চক্ষুর সম্মুখে সে দেখিতে পায় সে গানে ও চিত্রে অস্বাস্থ্যকর বৈদেশিক প্রভাবের লেশমাত্র নাই, অসংঘমের কলুষ কোথাও তাহার পবিত্রতা নষ্ট করে নাই। তাহা স্বচ্ছ, নির্মল ও পুস্ত স্রোতস্বিনীর গায় তরন্তর বেগে বহিয়া চলিয়াছে। বঙ্গবাসী তাহা আকর্ষণ পান করিয়া ধন্ত হউক।

সাহিত্যে মৌলিকতা

মৌলিকতা যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের একটা প্রধান গুণ তাহা সর্বজন-স্বীকৃত। কিন্তু সাহিত্যের প্রকারভেদ অনুসারে এই শব্দটির অর্থও পরিবর্তিত হইতে থাকে, একথা ভুলিগেও চলিবে না। সাধারণভাবে অভিনব বস্তু সৃষ্টি করিবার ক্ষমতাকে মৌলিকতা নামে সংজ্ঞিত করা যাইতে পারে, কিন্তু সাহিত্য-বিশেষে এই 'বস্তু'টি আখ্যান-বস্তু কিংবা ভাব-বস্তু হইতে পারে। কাব্য ও নাটকে আমরা যে মৌলিকতার সন্ধান করি তাহা বিষয়গত নহে ভাবগত, অর্থাৎ আখ্যান-বস্তু অভিনব না হইলেও মৌলিকতার হানি হয় না, যদি ভাব, রস ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি অক্ষুণ্ণ থাকে।

কালিদাস, সেক্সপীয়ার প্রভৃতি মহাকবিদের কাব্যনাটকে দেখিতে পাই যে, তাঁহারা রস-সৃষ্টির উপাদানের জন্ম প্রায়ই পূর্ব সৃষ্টিগণের নিকট খুঁজি। সুতরাং তাঁহাদের মৌলিকতা বিষয়ের মধ্যে নিবদ্ধ নহে, এমন কি বিষয়গত সৃষ্টিকে তাঁহারা তুচ্ছ বা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু পুরাতন মাল-মসলা লইয়া তাঁহারা যে অক্ষুরস্ব সৌন্দর্য্য ও জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদিগকে অতুলনীয় মৌলিকতা দান করিয়াছে।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

গীতিকাব্য সম্বন্ধে উক্ত নিয়মের একটু ব্যতিক্রম বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে। ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বিষয়ের কথা ছাড়িয়া দিই; কারণ তাহা সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি, যদিও নাটকে ও বর্ণনাত্মক কাব্যে পুরাণেতিহাসের অন্ধ অনুবর্তন মৌলিকতার হানিকর বলিয়া বিবেচিত হইবে; বিশেষতঃ প্রতিভাহীন লেখকের পক্ষে। কিন্তু কোন বিশেষ ঐতিহাসিক, পৌরাণিক বা কিংবদন্তীমূলক কাহিনীকে কবি যখন ভাব ভঙ্গীতে সৌন্দর্য্যময়ী গীতি-কবিতার আকার দান করেন, তখন তাহার মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। গীতি-কবিতা প্রায়ই আখ্যান-বস্তুর অপেক্ষা রাখে না, কারণ তাহা ভাবরসঘন। বৈষ্ণব পদাবলী ও রবীন্দ্রনাথ, শেলী, কীট্‌স, ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি কবিশ্রেষ্ঠগণের অসংখ্য কবিতা ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কোন কোন কাব্য নাটকে বিষয়গত ও ভাবগত মৌলিকতা রক্ষিত হইলেও অনুকরণের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলেও সাহিত্য হিসাবে এই শ্রেণীর রচনা নিকৃষ্ট না হইতে পারে। সেক্সপীয়রের 'রিচার্ড দি সেকেন্ড', মালের 'এড্‌ওয়ার্ড দি সেকেন্ড' নামক নাটকের অনুকরণে লিখিত।

আমাদের ছিজেড্রুলালের 'সাজাহানের' উপর সেক্সপীয়রের 'কিং লিয়ারের' ছায়া বিশেষরূপে পড়িয়াছে। কিন্তু অনুকরণের গন্ধ থাকিলেও 'রিচার্ড দি সেকেন্ড' একখানি উৎকৃষ্ট নাটক; এবং 'সাজাহানের' মৌলিকতা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

'মেঘনাদবধ' ও 'বৃক্সংহার' আমাদের ভাষায় দুইখানি আধুনিক

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

মহাকাব্য এবং এই দুই মহাকাব্য যে বঙ্গ সাহিত্যের মুকুটমণি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুইখানি কাব্যই যে পাশ্চাত্য মহাকাব্যের অনুলকরণে রচিত তাহা বঙ্গসাহিত্যের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

ববীন্দ্রনাথের কোন কোন শ্রেষ্ঠ কবিত্তার ভাব দেশীয় ও বিদেশীয় কবিতার মধ্যে নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার 'মদন ভস্মের পর' নামক অনুপম কবিতাটির মূলভাব কবি রাজশেখরের যে সংস্কৃত শ্লোকটি হইতে গৃহীত, তাহা কবি কালিদাস রায় এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

মানকেতনে দহিয়া বিধি করেছ একি রঙ্গ,
মনতাহীন পেয়েছ সে যে ভুবনভরা অঙ্গ ;
পঞ্চশর ভাঙ্গিয়া তার হয়েছে শর লক্ষ ;
করিল আগে কদম সম বিধিয়া দেহ বক্ষ ।

এইরূপ 'সিকুতীরে' শীর্ষক রূপক-কবিতাটির সহিত Leonora নামক একটি জার্মান গাথার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সার ওয়াল্টার স্কট এই গাথাটির William and Helen নাম দিয়া একটি ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছিলেন।

এই কবিতায় আমরা দেখি যে অন্ধরাত্রে নিদ্রোথিতা হেলেন তাহার গৃহসম্মুখে এক অস্বারোহী পুরুষ দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহাকে তাহার প্রণয়ী উইলিয়ম বলিয়া চিনিতে পারে, এবং তাহার নির্দেশক্রমে সে সেই পুরুষেরই পার্শ্বে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে। তারপরে বিদ্যুদ্বেগে ষোড়া ছুটিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহার। কত পথ অতিবাহন

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

করিল, কত দেশে, কত বন, কত প্রান্তর অতিক্রম করিল ; কিন্তু পুরুষটি একটি কথাও কহিল না, এমন কি তাহার মুখ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না ।

তারপর রাত্রিশেষে অন্ধারোহী একটি গির্জার মধ্যে এক উন্মুক্ত কবরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল । সেইখানে সেই পুরুষমূর্তি প্রথম কথা কহিল, এবং সে যে মৃত উইলিয়মের প্রেতাত্মা তাহা হেলেনকে জানাইয়া দিল ।

রবীন্দ্রনাথ এই গাথাটি হইতে যদি 'সিকুতীরে' কবিতার প্রেরণা পাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও বলিতে হইবে তিনি গৃহীত আখ্যানটিকে উপলক্ষ-মাত্র করিয়া ভাব রাজ্যের অতি উচ্চস্তরে বিচরণ করিয়াছেন । সুতরাং মিল্টনের II Penseosoর সহিত ফ্লেচারের একটি ক্ষুদ্র কবিতার যে সম্বন্ধ রবীন্দ্রনাথেরও এইসকল কবিতার সহিত সাদৃশ্যমূলক অন্যান্য কবিতার সেই সম্বন্ধ ।

অনুসন্ধান করিলে হয়ত এরূপ সাদৃশ্য আরও অনেক বাহির করিতে পারা যায় । কিন্তু কবির শ্রেষ্ঠত্ব তাহাতে একটুও খর্ব হয় না ।

এইবার উপন্যাস ও গল্পসাহিত্যের কথা বলি । ক্ষেত্রে মৌলিকতা শুধু ভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে চলিবে না, আখ্যানগত হওয়াও চাই । যখন আমরা নূতন গল্প গুনিবার জন্ত কোন উপন্যাস বা গল্প-পুস্তক পাঠে প্রবৃত্ত হই, তখন গল্পটি সত্যই নূতন হইবে ইহাই আশা করিয়া থাকি । সুতরাং এসব ক্ষেত্রে প্লট বা আখ্যানাংশের মৌলিকতা একান্ত আবশ্যিক বলিয়া মনে করি ।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

অবশ্য ইহারও ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, এমন কি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরও হাতে। যখন কোন লেখক সর্বজন-পরিচিত কোন নাটক বা কাব্যের নামানুসারে স্বরচিত গল্পের নামকরণ করিয়া থাকেন, তখন তিনি সকলকে জানাইয়াই দিতেছেন যে পূর্বপরিচিত উপাখ্যানের সহিত তাহার বর্ণিত কাহিনীর একটা সাদৃশ্য থাকিবে। কিন্তু এরূপ সাদৃশ্য সত্ত্বেও পাকা শিল্পীর হাতে এই শ্রেণীর গল্পও যে খুব উপভোগ্য হয় তাহার উদাহরণ টুর্গেনিভের *Lear of the Steppes* ও ব্রেট হাটের *The Iliad of Sandy Bar*. কিংলিয়রের গল্প যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং আধুনিক জগতেও এরূপ ঘটনা ঘটতে পারে তাহাই টুর্গেনিভের গল্পে আমরা দেখিতে পাই। অপর গল্পটিতে যে কলহ বর্ণিত হইয়াছে তাহার উপর ইলিয়াডের ক্ষীণ ছায়া পড়িয়াছে।

আমাদের সাহিত্যের কোন কোন উৎকৃষ্ট উপন্যাস ও গল্পের উপর ইংরাজি উপন্যাস-বিশেষের ছায়াপাত আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। কিন্তু আটের দিক দিয়া সে বইগুলি এত সুন্দর যে মৌলিকতা হিসাবে সে গুলিতে কোন ত্রুটি আছে কিনা তাহার বিচার করিবার প্রয়োজন আমাদের মনে হয় না।

বঙ্কিমবাবুর 'দুর্গেশনন্দিনীর' সহিত স্বটের 'আইভ্যাংহো'র সাদৃশ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রকে নাকি এসম্বন্ধে একবার প্রশ্নও করা হইয়াছিল। শোনা যায়, তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিবার পূর্বে তিনি স্বটের উক্ত উপন্যাসখানি পড়েন নাই।

সে যাহা হউক, বঙ্কিমবাবুর এই প্রথম উপন্যাসখানির আখ্যানভাগ

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

যথেষ্ট পরিমাণে মৌলিক না হইলেও ইহা যে আমাদের সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তাহা স্বীকার করিতে কেহ কুণ্ঠিত হইবেন কি ?

আরও একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের উদাহরণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিব, উৎকৃষ্টতা হিসাবে যাহার স্থান 'দুর্গেশনন্দিনী'রও অনেক উপরে এবং যাহার মৌলিকতা সম্বন্ধে এপর্যন্ত কোন প্রশ্ন উঠিয়াছে বলিয়া আমি অবগত নহি। ইহা হইতেছে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'।

এই সুবৃহৎ উপন্যাসখানির প্লট খুব ঘোরালো নয়। কিন্তু ষেটুকু প্লট অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি প্রকটিত হইয়াছে প্রায় তাহার সমস্তটুকুই জর্জ ইলিয়েটের ডেনিয়েল ডেরোণ্ডা (Daniel Deronda) নামক উপন্যাসটিতে দেখিতে পাই।

ডেনিয়েল খ্রীষ্টান পরিবারে পালিত এবং নিজেকে খ্রীষ্টান বলিয়াই জানে; কিন্তু তাহার জন্ম রহস্যাবৃত ছিল। সে গোয়ার গ্রামই স্বদেশপ্রেমিক; সকল সংকার্যেই সে অগ্রণী, একদিন সে নদীতে আত্মহত্যায় উদ্ভূতা এক সুন্দরী যিহুদী বুবতীকে উদ্ধার করিয়া তাহার বন্ধুর বাড়ীতে তাহাকে রাখিয়া আসে। এই মেয়েটির নাম মীরা। মীরা ডেনিয়েলের প্রেমে পড়িল। ক্রমে ডেনিয়েলও বুঝিতে পারে যে, সে মীরাকে ভালবাসে। ছুইজনে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মনে করিয়া ডেনিয়েল যখন মীরাকে লাভ করিবার আশা বিসর্জন দিয়াছিল, তখন একদিন হঠাৎ সে জানিতে পারিল যে সে খ্রীষ্টান নয়, তাহার জন্ম এক যিহুদী পরিবারে। তখন আর বিবাহের কোন বাধা রহিল না।

প্লটের এই একই কাঠামো উভয় উপন্যাসে প্রতিভাবান শিল্পীর হাতে

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

এমনই স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়াছে যে গোরাকে ডেনিয়েল ডেরোগোর
অনুকরণ বলা ঘোর ধ্বংসের পরিচায়ক হইবে।

রবীন্দ্রনাথের কোন কোন ছোট গল্পেরও উপাদান পাশ্চাত্য সাহিত্য
হইতে হস্ত গৃহীত হইয়াছে। টলষ্টয়ের Resurrection নামক
উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ পড়িলেই রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্পটি
মনে পড়িয়া যায় ষ্ট্যাট্‌টারি সিভিলিয়ান মোহিতমোহন প্রথম
যৌবনে ছাত্রাবস্থায় যে বালিকাটির সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, বহুকাল
পরে যখন তিনি 'বিচারক' পদে আসীন, তখন তাঁহারই এজলাসে সন্তান-
হত্যা ও আত্মহত্যা চেষ্টার অপরাধে সেই রমণীই অভিযুক্ত—রবীন্দ্রনাথের
গল্পে অদৃষ্টের এই নিষ্ঠুর পরিহাস অভিনীত হইতে দেখি।

টলষ্টয়ের উপন্যাসের সম্ভ্রান্তবংশীয় নায়ক বিচারালয়ে জুরিতে বসিয়া
কাঠগড়ায় যে নারীকে অপরাধিনীরূপে দণ্ডায়মানা দেখিল, সেই সমাজ-
পরিত্যক্তা নারী তাহারই প্রথম যৌবনের উদ্যম অসংঘের সমস্ত শাস্তি,
সমস্ত কলঙ্ক নিজ মস্তকে বহন করিয়া সেই মুহূর্ত্তে বিচারকের
দণ্ডাজ্ঞার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছিল। সাদৃশ্য বেশ স্পষ্ট, শুধু রবীন্দ্রনাথের
'বিচারক' আমাদের গল্পসাহিত্যের একটি রত্ন।

তাঁহার 'স্ত্রীর পত্র' ও ইব্‌সেনের 'Dolls House' এর মধ্যেও বেশ
একটা ভাবসাম্য আছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যেও ষাঁহার শীর্ষস্থানীয় বলিয়া গণ্য তাঁহাদের
উপন্যাসাবলীতেও সমগ্র ভাবে না হউক, ঘটনার বা চরিত্রে বিলক্ষণ
মিল লক্ষিত হয়। মোটের উপর ধরিতে গেলে হস্ত জর্জ মেরিডিথের
Ordeal of Richard Feveril. ও টুর্গেনিভের Torrents of Spring

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

নামক উপন্যাসদ্বয়ের মধ্যে আখ্যানগত বৈষম্যই বর্তমান। কিন্তু তাহা হইলেও উভয় উপন্যাসেরই যেটি প্রধান ঘটনা তাহাতে প্রকৃতপক্ষে বিশেষ পার্থক্য নাই। উভয় উপন্যাসেরই নায়ক সচ্চরিত্র যুবক; যখন তাহার প্রেমে পড়িল তখন তাহাদের সেই প্রেম যেমনই গভীর, তেমনই পবিত্র। রিচার্ড তাহার প্রণয়িনীকে স্বীয় পিতার ঘোর অসম্মতি সত্ত্বেও বিবাহ করিল; অপর উপন্যাসের নায়ক তাহার প্রেমসীকে আর একদিন পরেই গৃহলক্ষ্মী করিবে; কিন্তু অভাবনীয় ঘটনাচক্রে পড়িয়া উভয়েই কুহকিনী নারীর প্রলোভনে একমুহূর্ত্তে প্রেম, ধর্ম, সুখ সমস্ত বিসর্জন দিল। বিভিন্ন সাহিত্যের দুইখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের সর্বপ্রধান ঘটনার এই মিল অনুধাবনযোগ্য নহে কি ?

কখনও কখনও এমনও দেখা যায় যে ঘটনার এইরূপ সাদৃশ্য না থাকিলেও একটি উপন্যাসের কোন বিশেষ স্মরণীয় চরিত্র অন্য উপন্যাসে নিজের সমস্ত বিশেষত্ব লইয়া ভিন্ন মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছে।

এইরূপ চারিত্রিক পুনর্জন্মের প্রকৃষ্ট উদাহরণ তিনটি বিভিন্ন দেশের তিনখানি উপন্যাস হইতে দেওয়া যাইতে পারে। গেটের Wilhelm Meister নামক উপন্যাসের লাস্ত্রলীলাময়ী আন্দোচ্ছাসস্বরূপিণী Mignon ভিক্টর হুগোর Notre Dame et Ismoralda রূপে এবং স্কটের Peveril of the Peak এ ফেনেলা (Fenella) চরিত্রে নবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' এবং শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহে'র মধ্যে ঘটনার পার্থক্যসত্ত্বেও একটি চরিত্রগত ঐক্যের ভাব চোখে পড়ে। অন্ততঃ, এই দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে এইরূপ একটা তুলনামূলক আলোচনার অবসর পাওয়া যায়।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

নিখিলেশের সহিত মহিমের এবং সন্দীপের সহিত সুরেশের তুলনা স্বতঃই মনে আসে। অচলা ঠিক বিমলা নয় বটে, কিন্তু অবস্থার ক্রীড়নক এবং পরপুরুষে আসক্তারূপে এই দুই নারীকায়েরূপে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে একটি বেশ সাদৃশ্য আছে।

প্রভেদের মধ্যে এই যে বিমলাকে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যন্ত সন্দীপের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু একরূপ ভীষণ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষের লোলুপ গ্রাস হইতে দুর্বল-প্রকৃতি নারী যে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না, বিশেষতঃ আদর্শচরিত্র স্বামী যদি তাহাকে পূর্ণস্বাধীনতা দেয়, অচলার শোচনীয় পরিণামে শরৎচন্দ্র তাহাই দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে যাহা idealistic বা আদর্শসৃষ্টি, 'গৃহদাহে' তাহাই realistic বা বাস্তবজগতের বিষয় হইয়াছে।

ঠিক এইরূপ একটা তুলনামূলক সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র মধ্যে চলিতে পারে। একদিকে গোবিন্দলাল, ভ্রমর, রোহিণী; অপরদিকে মহেন্দ্রনাথ, আশা, বিনোদিনী। কিন্তু এখানেও একটা পার্থক্য আছে। বিনোদিনী মহেন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করিলেও রোহিণীর ন্যায় পাপিষ্ঠা নয়। ফলে, গোবিন্দলালের ভীষণ ট্রাজিডি মহেন্দ্রনাথের পক্ষে অর্দ্ধপথে থামিয়া গিয়াছে।

'বিষয়ক্ষে' এই একই তথ্য রূপজ মোহের প্রাবল্যের মধ্যে নিহিত। নগেন্দ্রনাথ মহেন্দ্রের ন্যায়ই দুর্বলচিত্ত এবং ভালমন্দ বিচার ত্যাগ করিয়া রূপের আশুনে ঝাঁপ দিয়াছিল।

এইখানে একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটা কথা বলিয়া

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

রাখি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সকল উপন্যাসেই চরিত্রগুলিকে পাপের পঙ্কিলতা হইতে সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন।

‘নষ্টনীড়’, ‘ঘরে বাইরে’, ‘চোখের বালি’ সর্বত্রই এই একই চিত্র। বন্ধিমচন্দ্রে ও শরৎচন্দ্রে মানবচরিত্রের দুর্বলতার দিকটা বেশী প্রকট হইয়াছে, ট্রাজিডিও গভীরতর হইয়াছে।

গোবিন্দলাল ও রোহিণী, সুরেশ ও অচলা এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মহেন্দ্রনাথ ও বিনোদিনী বা সন্দীপ ও বিমলা হইতে স্বতন্ত্র।

উপরে যে কয়খানি উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রগত সাদৃশ্যের কথা বলা হইল, সেগুলির মধ্যে কোনটিরই যে মৌলিকতা অপর কোনটির সঙ্গে তুলনায় হীন তাহা মনে করিবার কারণ নাই। পবিত্র দাম্পত্যপ্রেমের পার্শ্বে উন্নত লালসার বিষময় ফল-প্রদর্শন যে অনেক উপন্যাসের আখ্যান-ভাগের বিষয়ীভূত হইয়াছে, তাহার কারণ ইহা নয় যে, একজন অপরের নিকট হইতে ইহার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন; তাহার কারণ ইহাই যে, একরূপ ব্যাপার জগতে সর্বত্র অত্যন্ত সাধারণ।

তাই পাশ্চাত্য সাহিত্যে যেমন Ordeal of Richard Feveril বা Torrents of Spring (খ্যাকারের Vanity Fair ও জর্জ ইলিয়টের Mill on the Flossএর স্থানবিশেষেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে), আমাদের সাহিত্যেও তেমনই ‘রুক্ষকান্তের উইল’ বা ‘চোখের বালি’র মত উপন্যাস ঐ একই চিত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। আর যদিও বা কোন কোন ক্ষেত্রে কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভাব বা প্রেরণার জন্ত অপরের নিকট ঋণী হই হইলেও সেই প্রতিভাবান্ লেখক পরস্বকে এমনইভাবে নিজস্ব করিয়া লইতে

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

• জানেন যে, পাঠক বা সমালোচক কাহারও নিকট সেই ঋণগ্রহণটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। শুধু কাব্য ও নাটকেই নয়, মৌলিকতার দাবী যেখানে সর্বাপেক্ষা বেশী সেই উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম খাটে।

এপর্যন্ত আমরা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের কথাই আলোচনা করিয়াছি। নিকৃষ্ট লেখকের হাতে মৌলিকতার অভাব যে অক্ষম অনুকরণের পরিচায়ক তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। সে অপ্ৰীতিকর প্রসঙ্গ লইতে বিরত হইলাম।

স্বভাব-কবি গোবিন্দদাস

কুকুম, কস্তুরী, চন্দন প্রভৃতির কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস জীবদ্দশায়ই সাধারণের নিকট যথোচিত সমাদর লাভ করিতে পারেন নাই ; মৃত্যুর পর লোকে যে তাঁহাকে প্রায় বিশ্বৃত হইয়া যাইবে, তাহাই স্বভাবিক । হইয়াছেও তাহাই । জীবনব্যাপী দুঃখদারিদ্র্যের তীব্র হলাহল নিজে আকণ্ঠ পান করিয়া সুমধুর কাব্যায়ত তিনি বঙ্গবাসীকে বিতবণ করিয়া গিয়াছেন । কিন্তু দরিদ্র কবির সে দান বাঙ্গালী উপেক্ষায় অবহেলায় দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে । বাজারে তাঁহার বইগুলি কিনিতে পাওয়া যায় না ; কাহারও মুখে আজ তাঁহার নামও বড় শোনা যায় না ।

কিন্তু সত্যই কি তিনি এই গভীর অনাদরের যোগ্য ? একথা সত্য বটে যে শ্রেষ্ঠ কবি ব্যতীত অমরত্বের দাবী কেহ করিতে পারে না, এবং গোবিন্দচন্দ্র রবীন্দ্র, মাইকেলের সঙ্গে তুলিত হইতে পারেন না । কিন্তু ইহাও কি সত্য নয় যে রবীন্দ্রীয় যুগে কবিশূর্যের অত্যাঙ্গুল প্রতিভালোক যখন সকল লোকেরই চোখ ধাঁধিয়া দিতেছিল, যখন গিরিশ-স্বিজেন্দ্রের অসামান্য নাট্য-প্রতিভা বাঙ্গালীর জাতীয় ও সামাজিক জীবনকে বিচিত্র আকারে প্রকাশ করিতেছিল, তখন অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে তিন চারিজন কবি তাঁহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাঙ্গালীকে

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

আনন্দ দান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; গোবিন্দদাস তাঁহাদেরই অন্যতম ছিলেন? সুতরাং একথা আমাদেরকে মানিতেই হইবে যে যদি তাঁহার অবস্থা অনুকূল হইত, যদি তাঁহার পুস্তকগুলি ভাল করিয়া ছাপাইবার ও বিজ্ঞাপন দিবার সঙ্গতি থাকিত এবং অর্থান্ধাবশতঃ বহু সুন্দর কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার অক্ষমতা না হইত, তাহা হইলে হয়ত আমরা তাঁহার প্রতি এতটা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে পারিতাম না। তিনি যে একজন প্রকৃত কবি ছিলেন তাহা সর্বজনস্বীকৃত: কবির মৃত্যুর পর সুকবি কালিদাস রায় তাঁহাকে আহ্বান করিয়া যে বলিয়াছিলেন—

চেষ্টা ক'রে হওনে কবি,
কবি হ'য়েই জন্ম নিলে
প্রাচীন গ্রামল বাংলামাটি চিরে ;
তোমার কবি-প্রতিভাটির
প্রতিমাটি তিলে তিলে
তৈরি নহে শিক্ষণালার ভিড়ে।

তাহা স্বভাব কবি গোবিন্দদাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য।

প্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে বনের পাখী যেমন গান গাহিয়া বেড়ায়, কেহ গুলিল কিনা চাহিয়াও দেখে না, তেমনই স্বভাবের শিশু এই অখ্যাত কবিটি আপনার অন্তর্নিহিত কবিত্বের প্রেরণায় গাহিয়া গিয়াছেন, নিন্দা সুখ্যাতির অপেক্ষা রাখেন নাই।

সে আজ অনেক দিনের কথা যখন গোবিন্দচন্দ্রের প্রথম কবিতা পুস্তক 'প্রেম ও ফুল' বাঙ্গালার সাহিত্যমোদিগণের হৃদয়ে এক অপূর্ব পুলক-স্পন্দনের সঞ্চার করিয়াছিল। হেম-নবীনের যুগ তখনও শেষ হয়

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

নাই, বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশ রবিপ্রভার তখনও পূর্ণ সমুজ্জল হইয়া উঠে নাই, বাঙ্গালার সারস্বত কুঞ্জে তখনও অগ্ন্যাণু কবিদের প্রভাতী গানের ঝঙ্কার ভাল করিয়া শোনা যায় নাই। রবীন্দ্রনাথের 'সোণার তরী' ইহার চারি বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল তখনও প্রায় অজ্ঞাত; তাঁহার 'আর্য্যগাথা'র প্রথমভাগ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় কুমারও তখন সবে মাত্র কবি-খ্যাতি অর্জন করিতেছেন সেই সময়ে আর একজন কবির যশ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং ইহার অল্পদিন পরেই—যৌবনেই তাঁহার ভবলীলা সাজ হইয়া যায়। তাঁহার নাম রাজকৃষ্ণ রায়। দুইজনের জীবনের অবস্থাগত সাদৃশ্য বড় বেশী চোখে পড়ে। একই সময়ে দুইজনের জন্ম—গোবিন্দদাস ১২৬১ সালে, রাজকৃষ্ণ রায় পরবৎসরে। দারিদ্র্যের জন্ম উভয়েরই উপযুক্ত শিক্ষার অভাব এবং অশেষ দুঃখ দুর্দশার মধ্যে উভয়েরই সারাটা জীবন-যাপন—এরূপ ব্যাপার আর কোন সাহিত্যিকের জীবনে দেখা যায় না। দুইজনেরই কবি-প্রতিভা খুব অল্প বয়সেই বিকশিত এবং দুইজনেই একই ভাবে অনাদৃত ও উপেক্ষিত! প্রভেদের মধ্যে এই যে রাজকৃষ্ণ রায় আটত্রিশ বৎসর মাত্র বয়সেই দুর্দশার তাড়নার ধরাধাম ত্যাগ করিয়া যান, কিন্তু গোবিন্দদাস ঘোর প্রতিকূল অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ৬৪ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিলেন।

এই সমভাগ্য কবিদ্বয় পরস্পরের নিকট অজ্ঞাতও ছিলেন না। রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বীণা' পত্রিকাতেই গোবিন্দচন্দ্রের কবি-জীবনের সূচনা হয়! রাজকৃষ্ণ রায় অনাদৃত হইলেও তাহার গ্রন্থাবলী এখনও কিনিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহার 'নরমেধ যজ্ঞ', 'প্রহ্লাদ চরিত্র' প্রভৃতি

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

কোন কোন নাটক এখনও মাঝে মাঝে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া থাকে। কিন্তু গোবিন্দদাস এই কয় বৎসরের মধ্যেই বিস্মৃত-প্রায়।

এই বিস্মৃতির কবল হইতে তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টায় কবির বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁহার জীবনচরিত প্রকাশিত করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এই সুলিখিত পুস্তকখানি লেখকের লিপিকুশলতার গুণে অতিশয় হৃদয়গ্রাহী এবং উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

ইহা পাঠ করিয়া কবিকে চিনিয়া লইতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না। গ্রন্থকারের একটি প্রধান গুণ তাঁহার নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতা। তিনি কাহারও ভয়ে কোন সত্য বা তথ্য গোপন করেন নাই। এবং কবির বন্ধু হইলেও তাঁহার দৌর্বল্যের দিকটিও দেখাইতে কুণ্ঠিত হন নাই।

আমরা দেখিতে পাই, কবি গোবিন্দদাস একদিকে যেমন প্রবলের ঘোর অত্যাচারে অর্জ্জরিত হইয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনই স্বীয় চরিত্রগত অব্যবহিত-চিত্ততার জন্ত অনেক সময়ে নিজের বিপদ নিজে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন।

এই দুইটা কারণ—একটি ভিতরের, অণ্ডটি বাহিরের—দুইটাই গ্রন্থের ন্যায় কবির প্রায় সমস্ত দুঃখদুর্দশার মূলে যে বর্তমান ছিল তাহা লেখক অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। এই সত্যবাদিতা গ্রন্থখানিকে অতিশয় মূল্যবান করিয়া তুলিয়াছে।

ইতিপূর্বে বাঙ্গালা-ভাষায় আরও কয়েকখানি জীবনচরিত পাঠ করিয়াছিলাম। সে সব পুস্তকের স্থলে স্থলে সত্যের অপলাপ দেখিয়া কষ্ট বোধ করিয়াছিলাম, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মাসিকের পৃষ্ঠায়

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিতেও বাধ্য হইয়াছিলাম। গোবিন্দদাস দরিদ্র হইলেও তেজস্বী, নির্ভীক ও সত্যবাদী ছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত লেখকেও সেই সকল গুণের সমাবেশ দেখিয়া সকলেই প্রীত হইবেন।

দরিদ্র পরিবারেই এই পল্লীকবির জন্ম, এবং আজীবন ভীষণ দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। ‘শতগ্রন্থি ছিন্নবাস, একাহার উপবাস’ ব্যতীত তাঁহার ভাগ্যে আর কিছু ছোটে নাই। কিন্তু দারিদ্র্যেই যদি তাঁহার সমস্ত দুঃখ পর্য্যবসিত হইত, তাহা হইলে ত তাঁহাকে সুখী বলা যাইতে পারিত। প্রথমা পত্নী ও দুই কণ্ঠার মৃত্যু তাঁহার জীবনে বিষাদের গাঢ় ছায়া আনিয়া দিয়াছিল, তাহাও সত্য। কিন্তু ইহাও কিছু অসাধারণ নহে। আমাদের দেশের অনেক কবিরই নাম করিতে পারা যায় যাহাদের বৃকে পত্নীবিয়োগজনিত শোকের ব্যথা বাজিয়াছিল। সম্মানের মৃত্যুশোক ভোগ করিতে হয় নাই এমন লোকও বিরল। অবশ্য দারিদ্র্য-দুঃখের সহিত স্বজন-বিয়োগ-শোক মিলিত হওয়ার এই উভয়বিধ কষ্টই গোবিন্দদাসের পক্ষে তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু জীবনে যে দুঃখ তাঁহার দুর্বিষহ হইয়াছিল তাহা হইতেছে—বিনাদোষে স্বদেশ হইতে নির্বাসন। তাঁহার যে বাসভূমি অয়দেবপুর (ভাওয়াল) গ্রামটিকে তিনি ‘শতস্বর্গ, শতকানী’ অপেক্ষা ভালবাসিতেন, সেখান হইতে মিথ্যা অপবাদে যখন খামখেয়ালী জমিদারের কঠোর আদেশে নির্বাসিত হইলেন, তখন তাঁহার দুঃখের ভরা পূর্ণ হইল। তাঁহার ‘চন্দন’ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত নির্বাসিতের আবেদন নামক কবিতা পাঠ করিলে পাষণ্ড-হৃদয়ও বিগলিত হয়। হেমবাবু তাঁহার ‘গোবিন্দদাসে’ এই ব্যাপারটির যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন তাহা

গীতাঞ্জলির ভাবধার

হইতে জানিতে পারি যে, এই অত্যাচারের মূলে ছিলেন ঢাকার একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক—এবং এই প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তির কুচক্রান্তে গোবিন্দদাসকে অনেক দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছে। এই অত্যাচারের যখন কোন প্রতিবিধান হইল না, তখন কবি তাহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন অতি ভীষ ভাষায় ‘মগের মলুক’ নামক ব্যঙ্গ-কাব্য লিখিয়া।

এই আক্রমণে গোবিন্দদাস সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই। ফলে তাঁহাকে মানহানির মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। এই সব কারণে তাঁহার জীবনটা এতই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, শেষ জীবনে যখন একটি সুদীর্ঘ রোগভোগের পর আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে তিনি মুক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তিনি ‘কেন বাঁচালে আমার’ শীর্ষক একটি সুকরণ কবিতায় এইরূপ মর্মান্বিত ভাষায় নিজের দুঃখ নিবেদন করিয়াছিলেন—

কেন বাঁচালে আমার ?
আমি ভেবেছিলাম, হরি এবার করুণা করি
ঘুচাইবে অভাগার এ ভবের দার,
যত দুঃখ, যত ক্লেশ সকলি হইবে শেষ,
কাদিতে হবে না আর ব্যথা বেদনায় ।
আমি ত ভাবিনি রোগ, ভেবেছি মাহেস্ত্রবোধ
তিলে তিলে পলে পলে আশার আশার,
ভেবেছি মরণ মাঝি লইতে আসিবে আশি
অচিরে ভেটিব গিরে তব রাজ্য পার ।

এই করণ বিলোপোক্তি পাঠ করিয়া চেনিসনের করেক ছত্র হৃদয়ে
পড়িয়া যাব—

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

For sure no gladlier does the stranded wreck
See through the gray skirts of a lifting squall,
The boat that bears the hope of life approach
To save the life despaired of, then he saw
Death dawning on him, and the close of all.

মজ্জমান পোত-বন্ধে নর নিঃসহায়
দেখে যবে ঝঙ্কারিত দিগন্তের কোলে
একাট তরুণী আসে রক্ষিতে তাহার,
আখাসে, উল্লাসে যথা হৃদি তার দোলে,
ততোধিক পুলকিত অন্তরে নিশায়
হেরিল এ হতভাগ্য মৃত্যুর আলোকে—
অন্ধকার নিশা শেষে উবাভাস প্রায় ;
আজি তার অবসান সর্বদুঃখ শোক ।

তাঁহার মুক্তির এই ‘মাহেন্দ্রযোগ’ আসিতেও আর বড় বিলম্ব হইল না ।
ইহার তিন বৎসর পরে, ১৩২৫ সালের আশ্বিনের এক মধুর উষায় ঢাকা
নগরীর এক নিভৃত গৃহে কবি সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘কুল নীরবে যেমন
ঝরে তেমনি ক’রে ম’রে গেল কবি ।’

তাঁহার জীবন চরিত্রকার লিখিতেছেন—‘মৃত কবির প্রতি সম্মান
প্রদর্শনার্থ কোন কবি, কি লেখক, কি সাহিত্যিক তাহার শ্মশানে উপস্থিত
ছিলেন বলিয়া শুনা যায় নাই । দেশবাসিগণের নিকট তিনি পূর্বাপর যে
ব্যবহার পাইয়া গিয়াছেন শেষ দশায়ও তাহার একটুও তারতম্য হয় নাই ।’

তাঁহার মৃত্যুর পর অবশ্য এই নিয়মের-কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইয়াছিল ।
নানা সাময়িক পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে শোকসূচক ও প্রশংসাপূর্ণ আলোচনা
বাহির হইয়াছিল । সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায় প্রমুখ কবিগণ

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

তাঁহার প্রয়াণ-গীতি গাহিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি সমস্ত নিন্দাখ্যাতির বাহিরে।

এইবার গোবিন্দদাসের কাব্য সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিয়া এই ক্ষুদ্র আলোচনার উপসংহার করিব। গোবিন্দদাস কোন্ শ্রেণীর কবি ছিলেন আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের কোন্ কবির সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে, এই সব প্রশ্নের উত্থাপন না করিয়াও একথা অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে, খুব উচ্চ না হইলেও একটা স্থায়ী আসন তিনি বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যে চিরকাল অধিকার করিয়া থাকিবেন। তাঁহার কাব্যে ভাবের খুব গভীরতা না থাকিতে পারে, শিক্ষার অসম্পূর্ণতা বশতঃ আটের দিক হইতেও তাঁহার কাব্য সৌন্দর্যের অনেকস্থলে হানি হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি তাঁহার “হৃদয়ের উৎসমুখ হ'তে” যে অজস্র কবিত্বধারা স্বতঃ উৎসারিত হইয়া বাঙ্গালার গীতিকুঞ্জের একপাশে মৃদুকলধ্বনিতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা পার্বত্য নিঝরের গায়ই স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ ও সুন্দর, এবং তাহারই গায় তাহা সকল বাধা-বল্ল উপেক্ষা করিয়া আপনার বেগে বহিয়া চলিয়াছে। প্রতিভালোক-সম্পাতে তাহা সর্বত্র ঝলমল করিতেছে, এবং প্রকৃতির লীলা তাহার বৃকে প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। এক কথায় তাঁহার ‘স্বভাব-কবি’ নাম সার্থক হইয়াছে।

অগাণ্ঠ কবিদের গায় গোবিন্দদাসও প্রেমের কবিতাই বেশী লিখিয়াছেন; কিন্তু এই প্রেম নায়ক-নারিকার প্রেম নয়, ইহা কবির দেবেন্দ্রনাথ সেনের বিচিত্র প্রেমের গায় মধুর দাম্পত্যভাবে মণ্ডিত। আরও একটি বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের সাদৃশ্য খুব বেশী। একটি মাত্র কবিত্বপূর্ণ ভাব নানা বিচিত্র উপমাধারা প্রকাশ করিবার এই উভয়

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

কবিরই এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা যে, ভাবটি পাঠকের চোখের সামনে কল্পনার রঙ্গীন লীলার একটির পর একটি চিত্রে মূর্ত হইয়া উঠিতে থাকে।

দেবেন্দ্রনাথের অনেক কবিতা হইতে ইহার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। গোবিন্দদাসের 'কস্তুরী' কাব্যের 'কে বেশী সুন্দর' কবিতা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। কবি বালিকা ও যুবতীর সৌন্দর্য্যের এইরূপ তুলনা করিতেছেন :—

কে বেশী সুন্দর !

যুবতীর ভরা গার লাষণ্য উছলি যায়,
নয়নে নলিন নীল, মুখে শশধর।
বালিকা তারকা হাসে নিষ্কলঙ্ক নীলাকাশে
সদা শুক্লপঙ্ক পূর্ণ ক্ষুদ্র কলেবর
শতমুখে ভালবাসে তরঙ্গ মাতঙ্গ ভাসে
যুবতী পদ্মার মত বহে থরতর ;
ফুলবনে করে খেলা প্রদোষ প্রভাস্ত বেলা
অনাবিল প্রেমধারা বালিকা নিব্বর।
প্রভাতের শতদলে পরিপূর্ণ পরিমলে
যুবতী সহস্র-করে কোটে মনোহর ;
শিশিরের শেকালিকা নিশি শেষে সে বালিকা
ধসে পড়ে ছোঁয় পাশে একটি অমর।
যুবতী বিজলী আলা ত্রিভুবন করে আলা
সগর্বে চরণাঘাতে ভাঙ্গে ধরাধর ;
বালিকা জোনাকি হাসে, স্নেহের কিরণে ভাসে
শিথেনি অশনি-লীলা অঁাখি ইন্দীবর।
ইত্যাদি।

এরূপ উদাহরণ আরও অনেক দিতে পারা যায়।

গোবিন্দদাস স্বদেশ-প্রেমিক কবি ছিলেন। তাঁহার অলস স্বদেশ-প্রেম নানা কবিতায় উজ্জলভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রধানতঃ 'নব্য ভারতে'

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

এই সফল কবিতা প্রকাশিত হইত ; পুস্তকাকারে সুস্বচ্ছন্দভাবে তিনি আমাদের কাছে এই কবিতাগুলি দিয়া যাইতে পারেন নাই । আমাদের বর্তমান চুর্কশা স্মরণ করিয়া একস্থানে তিনি লিখিতেছেন—

আমরা মরিলে বাঁচি, বাঁচিয়া মরিয়া আছি,
ভারতে জনম শুধু মরণ কারণ ।

আবার অন্ত্র বাঙ্গালীর মনুষ্যত্বহীনতা দেখিয়া গভীর আক্ষেপে বলিয়াছেন—

বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত করে কয় ?

একবার রথযাত্রার সময় কবি লিখিলেন—

আবার লইয়া রথ, উজলিতে এ ভারত
যদি হে আসিলে জগন্নাথ,
কিন্তু কেন রথ খালি, হে কৃষ্ণ, হে বনমালী,
কোথা সে অর্জুন তব সাথ ?
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির, কোথা বুকোদর বীর
সহদেব কোথা সে নকুল ?
আজিও অজ্ঞাতবাস ? আজো বিরাটের দাস ?
আজিও কি ভাসে নাই ভুল ?
কোথা বীর ধনঞ্জয় রহিয়াছে এ সময় ?
কেহ যে হয় না আশুসার ?
ক্লীব কাপুরুষ বেশে ঘৃণিত দাসত্ব ক্রমে
জীবন যাপিব কত আর ?

এই তীব্র জালাময়ী উক্তি যে কাহাদের প্রতি প্রযুক্ত তাহা কাহারও বুঝিতে বাঁকি থাকে না । মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্য্যন্ত তিনি এই স্বদেশ-প্রীতির গান গাহিয়া দেশবাসীর মনে উদ্দীপনার—সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন । যে মাসে তিনি আমাদের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করেন সে

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

শাস্ত্রের নব্যভারতে 'অশুর পূজা' নামে তাঁহার একটি কবিতা বাহির হয়।
তাঁহার কিয়দংশ এইরূপ—

ধন্য তুমি হে বীরেন্দ্র, অশুর দুর্বিজয়।
শৌর্য তোমার, বীর্য তোমার, অনন্ত অক্ষয়।
ধন্য তোমার স্বদেশ প্রীতি, ধন্য তোমার অশুর-নীতি
ধন্য তোমার পুণ্যস্মৃতি বিনাশ করে ভয়।
তোমার ভীষণ রুদ্র মূর্তি, স্বাধীনতার অগ্নিস্কৃতি
মরণ-কাঁপা দিগ্বিজয় কি চরণ চাপা রয় ?
তোমার আঁখির সতেজ ভাষা, বিখ্যাতের বিপুল আশা
এক নিমিষে করে যে সে জগৎ জ্যোতির্গয়।
তোমার প্রবল স্বদেশভক্তি উঠছে ঠেলে সকল শক্তি
ধ্বলগিরির চেয়ে সে যে প্রবল অতিশয়।

ইংরাজী শিক্ষিত না হইলেও গোবিন্দদাস সমাজ-সংস্কারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। অনেক ভাল ভাল কবিতা তিনি এই উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন। বাল্য-বিবাহ, বর-পণ প্রভৃতি কুপ্রথার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় অনেক কবিতা তিনি রচনা করিয়াছেন। স্নেহলতার আত্মহত্যার পর দেশে যখন একটা ঘোর আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন সর্বত্র স্নেহলতার ছবি খুব বিক্রয় হইতেছিল। এই চিত্রের নিয়ে গোবিন্দদাসের এই কয়েক ছত্র কবিতা মুদ্রিত থাকিত—

রাজপুতানী মেয়ের মত, কর্ব না হয় জহরব্রত
তারাও নারী, মোরাও নারী,—নারীর হৃদয় দিয়া।
ধাকুক আমার বিয়া।

গোবিন্দদাস নিজে কিন্তু 'এরূপ আত্মহত্যা অতীব দুষণীয় বলিয়া মনে

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

করিয়াছিলেন এবং কিছুতেই ইহার প্রশংসা দেওয়া উচিত নয় মনে করিয়া
স্নেহমতীর হঠকারিতার নিন্দা করিয়া এক কবিতা লিখিয়াছিলেন।
কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি,—

কাল কি বে হতভাগী কেবোসিনে পুড়ে।
নাবীর মডক লাগাইলি বাঙ্গলা মলুক জুড়ে।
মনে যদি ভেদ ছিল তোর কর্কি না তুই বিয়া,—
কে নিচ্ছল কলাতলায়, গলায় গামছা দিয়া ?
আর্য্য নারীর কার্য্য নয় এ আত্মহত্যা কবা—
ইহকালেব পবকালেব নিন্দা নরক ভরা।
এ'ত নয় সে জহব ব্রত, এ যে নিষম পাপ,
নির্নিমিতে আত্মহত্যা বিধিব অভিশাপ।
লোকেব হিতে, দেশেব হিতে সমর্পিলে প্রাণ—
সে ত নয় বে আত্মহত্যা, সে যে আত্মদান।
আত্মদান আর আত্মহত্যা স্বগ নবক ভেদ,
বুঝলি না তুই বোকা মোয়ে ঐত বড় খেদ।

এই শ্রেণীর আরও অনেক কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে ইচ্ছা
করে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পরিসরে তাহা সম্ভব নয় তাঁহার কাব্যের
অন্যান্য দিক সম্বন্ধেও আজ আর কিছু বলা হইল না।

হেমবাবুর লিখিত জীবনচরিতখানি যদি এই অবজ্ঞাত কবির দিকে
সাধারণের দৃষ্টি একটুও আকৃষ্ট করে তাহা হইলে তাঁহার শ্রম ও অর্থব্যয়
সার্থক হইবে। তিনি তাঁহার গুরুতর কর্তব্য খুব যোগ্যতার সহিত
সম্পাদন করিয়াছেন। গ্রন্থের পুরোভাগে তিনি বঙ্কিমবাবুর এই উক্তিটি
উদ্ধৃত করিয়াছেন—“কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু
কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।”

লেখক যে আমাদেরকে কবি গোবিন্দদাসকে বুঝিতে বিশেষ সাহায্য

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

করিয়াছেন তাহা আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিব, এবং সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ সাহিত্যিক আর, এল, ষ্টিভেন্সনের ভাষায় বলিব,—

‘Biography usually so false to its office, does here for once perform for us some of the work of fiction, reminding us, that is, of the truly-mingled tissue of man’s nature, and how huge faults and shining virtues cohabit and persevere in the same character.’

অর্থাৎ জীবনচরিতকার সাধারণতঃ সত্য-কথনে উদাসীন হইলেও এক্ষেত্রে যেন কতকটা উপত্যাসের কাজ করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে মানব-প্রকৃতি বড়ই জটিল, তাহাতে সমুজ্জ্বল গুণরাশির সঙ্গে নানা গুরুতর দোষ বিবাজ্য কবে।
